মেঘাবৃত অশনি

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

মেঘাবৃত অশনি

অশনি রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল—ধরা পড়িবার ভয়ে নহে, ধরা পড়িবার পর। খবরের কাগজে সে, উদ্ধারণপুরের শৈলমূলে নবনির্ম্মিত একটি টুরিষ্টস্ রেষ্ট হাউসের সন্ধান পাইয়াছিল—সেইদিকে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। স্থানটি নূতন, সুতরাং দৃশ্যও নূতন; হোটেলটাও নূতন; এখনো সেখানে লোকসমাগম হয় নাই মনে করিয়া সেই নির্জ্জনতার দিকে, যেন কারাগৃহের প্রাচীর টপ্‌কাইয়া, আর, তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রহরারত পৃথিবীর চক্ষে ধুলা দিয়া, অশনি রায় প্রাণপণে ধাবিত হইল।

টুরিষ্টস্ রেষ্ট হাউসের বাড়ীটা নূতন; তার কোণে কোণে মাকড়সা এখনও জাল পাতে নাই, এবং দেয়ালে দেয়ালে পানের পিকের দাগ এখনো পড়ে নাই মনে করিয়া প্রধাবিত অশনির উৎসাহ আর আনন্দ আরো বাড়িয়া গেল।

অশনি রায় সাহিত্যিক—

অশনি রায়ের গল্পের বই 'নয়নে নয়ন' প্রকাশিত হইবার পরই পাঠকসমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—নূতন জিনিষ আসিয়াছে! পাঠকের আনন্দ আর লেখকের খ্যাতি দ্রুতগতি ছড়াইতে আরম্ভ করিল....

কিন্তু নির্জ্জলা দুধের মতো অবিমিশ্র খ্যাতিও দুর্লভ—

উৎকৃষ্ট সমালোচনা হইতে কে একজন বক্রচক্ষু সমালোচক বিস্তৃত সমালোচনার পর লিখিলেন: "এই বয়সেই"?

কিন্তু তাঁর ঐ প্রশ্নের মানে বুঝা যায় নাই। 'এই বয়সেই' এমন

চতুর, কি এমন অভিজ্ঞ, কি এমন লোলুপ, কি এমন দক্ষ, কি এমন দৃষ্টি, কি মোটের উপর এমন সুন্দর, ইহার ভিতর কোন্‌টা সেই সমালোচকের জিজ্ঞাস্য তা' তিনিই জানেন···

কিন্তু 'নয়নে নয়ন' পুস্তকের গল্পগুলিতে টেক্‌নিকের অপরূপ নিজস্বতা, আর, প্রকাশভঙ্গীতে অনিন্দ্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাগরীয় গভীরতা আর বায়বীয় লঘুতার অসামান্য সমাবেশ থাকিলেও ছোট গল্পই যে অশনি রায়ের প্রতিভার পরম আর চরম অবদান নহে তাহা বুঝা গেল তার উপন্যাস "সুন্দরী" বাহির হইলে। লোকে অবাক্ হইয়া গেল····

দেহের মারফৎ আত্মা, আত্মার মারফৎ প্রকৃতি, প্রকৃতির মারফৎ বিশ্ব, এবং বিশ্বের মারফৎ বিশ্বপতি, মাত্র দু'টি ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ যৌন-অনুভূতির, ভিতর দিয়া এমন সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, সজীব, আর, প্রবহমান হইয়া উঠিয়াছে যে, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল ; অশনি রায়ের নাম জানিতে কাহারো বাকি রহিল না—সদর মফঃস্বল একই তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল···

লোকে বলিল :

১। "বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, অভাবিতপূর্ব্ব"।

২। "জ্ঞানের গভীরতা, সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমা, বচন-বিন্যাসকৌশল, ভাষা, ভাব, প্রেরণাগত স্বাতন্ত্র্য, কল্পনার মৌলিকতা ও সরস সরলতা, আমাদিগকে বিস্মিত আর মুগ্ধ করিয়াছে"।

৩। "রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঝড়ের মতো দ্রুত গতিতে একটানা পড়েই যেতে হয়—থাম্‌বার উপায় নেই ; পড়বার সময় ভাবের কিম্বা অর্থের দিক্ দিয়ে বিচার করবার কথা মনেও ওঠে না ; এমন নিপুণতা অন্যত্র দেখেছি বলে' মনে পড়ে না"।

৪। "নরনারী অর্দ্ধ-বাস্তব ও অর্দ্ধ-কাল্পনিক ; স্বপ্ন ও জাগরণ

পরিমিত মাত্রায়, আর সূক্ষ্মতম একটি সীমারেখা বজায় রেখে' মিলিত হয়েছে। যে-বস্তু অশনি রায় বাংলাকে দিয়েছেন বিশ্বে তার তুলনা নাই"।

ইত্যাদি আরো কত!

এবং তারপর ছ'মাসের মধ্যেই দেখা দিল 'গভীর হইতে গভীরে'...

'গভীর হইতে গভীরে', এক কথায় মানুষকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল; প্রতিভার দুরন্ত জাগরণ; দুর্ব্বার জ্বলন্ত হইয়া সে দেখা দিয়াছে—যাদুকর অশনি, অদ্বিতীয় অশনি...সমালোচকগণ বিরুদ্ধে কলম তুলিতে পারিলেন না—

যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 'এই বয়সেই'? —শুনা গেল, তিনি অত্যন্ত অধোবদনে অন্য পথে দেশত্যাগ করিয়াছেন। আত্মার নরক-ভোগের যে প্রগাঢ় মিষ্টিক ব্যাখ্যা 'গভীর হইতে গভীরে' অশনি রায় আবিষ্কার করিয়াছে তাহা চরম....অনেকেই ভয় পাইয়া অনেক বদ্-অভ্যাস ত্যাগ করিল—বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ লেকের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অন্য কথা পাড়িতে লাগিল....

হল্লা উঠিল বেজায়—

'প্রতিভা' অশনি রায়ের 'দর্শন' চাই; কলিকাতার হল্‌দিঘাটা লেনের ২৭।৩ নম্বরের বাড়ী জনতা আক্রমণ করিল—দর্শন চাই, বাণী চাই, উপদেশ চাই, স্বাক্ষর চাই, অনুজ্ঞা চাই, অনুগ্রহ চাই....

সুতরাং অতিষ্ঠ হইয়া অশনি রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শৈলমূলস্থ উদ্ধারণপুর অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান; পাখীই কম। 'রেস্‌ট্ হাউস্' বাড়ীটা অত্যন্ত সুন্দর—লাল রঙের বাড়ীটা সুবৃহৎ; দেড় শত

ভ্রাম্যমাণ আমেরিকানের স্থান অক্লেশেই হইতে পারে। বান্দোবস্তও বেশ। নীচেকার হলঘরে এত চেয়ার টেবিল রাখা হইয়াছে যে, দেড়শত স্ত্রী-পুরুষ অভ্যাগত ব্যক্তি সেখানে বসিয়া 'চা বিস্কুট' খাইতে পারে।

কান্তিযুক্ত ম্যানেজার একখানা বিপুলাকার বাঁধানো খাতায় আগন্তুক অশনি রায়ের নামধাম লিখিয়া লইলেন। অশনির প্রকৃত নামধামই তিনি পাইলেন; কারণ, অশনি রায় আধুনিক হইলেও অদ্ভুত নয়; সে নাম-ঠিকানা গোপন করিল না, কিন্তু নিজের নামটি উচ্চারণ করিবার সময় সে একবার শিহরিয়া উঠিল....

আর নিস্তার নাই—লোকের ভিড় জমিল আর কি! কত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহারা ভক্তির বান ডাকাইবে তাহার ঠিক নাই। দাও 'দর্শন'....

তিনখানি বই লিখিয়া এত সংকটে পড়িতে হইবে জানিলে বই সে লিখিত না। আর কি লেখক বাংলায় নাই—অই ত' মুরলীধর সেন রহিয়াছেন, দময়ন্তীনাথ দে রহিয়াছেন, কুসুমিত লাহিড়ী রহিয়াছেন! যা-না বাপু তাদের কাছে! বাঙালীর একেবারে মাথা নাই বলিয়া একা তাহাকেই এই দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।

নাম লিখিয়া লইবার সময় ফ্যাসনেবল্ ম্যানেজার বাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন না—সে যে অপর কোন অশনি রায় নয়, 'সেই অশনি রায়' তাহা তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। লোকটা ব্যবসাদার বই ত' নয়! খাতাপত্র আর তরকারির হিসাব লইয়াই সে মত্ত। বাঙালীকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়া নেতাগণ বাঙালীর ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিতেছেন। চা'ল ডা'ল ঘুঁটে কয়লার বাজার-দর যাচাই করিতে করিতে মানুষের অন্য দিকে ঔৎসুক্য, অর্থাৎ জীবনের চারুতা আর রস, আর থাকে না; উদর-সর্ব্বস্বতায় ক্রমে মানুষের মনে হিংসা জাগে, আর, তার কাণ্ডজ্ঞানই নষ্ট হইয়া যায়, ইহা নেতারা বুঝেন না।

কিন্তু ম্যানেজার অশনিকে হঠাৎ চম্‌কাইয়া দিলেন; বলিলেন—আপনার নাম ত' লিখ্‌লাম, কিন্তু একটা ধোঁকায় পড়্‌লাম যে!

অশনির সন্দেহ রহিল না যে, ম্যানেজার এইবার জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি সেই সুবিখ্যাত অশনি রায়? অশনি এক সঙ্গেই উন্মুখ আর বিনীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ম্যানেজার তা' জিজ্ঞাসা করিলেন না; বলিলেন,—বাল্যকালে ভাষা পড়েছিলাম; সকল শব্দের অর্থ মনে নেই। কিছু মনে করবেন না দয়া করে'; জান্‌তে চাই, অশনি মানে বজ্র না বিদ্যুৎ?—বলিয়া তিনি অশনির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন, যেন তাঁর এই শব্দার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অশনির পক্ষেও একটা মজার কথা!

অপ্রত্যাশিতভাবে কথার মোড় ঘুরিয়া যাওয়ায় অশনি হতাশ হইল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু অশনি তা' নিজের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়; স্বীকার করিতে প্রস্তুত সে ইহাই যে, সে যেন একটা দুর্ভাবনার হাত হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছে; বলিল,—অশনি মানে বজ্র বিদ্যুৎ দুই-ই হয়।

শুনিয়া ম্যানেজার বলিলেন,—আজ্ঞে তা' হবে। ভাষার মা'রপ্যাচ্ আমরা কিছুই বুঝিনে। আমরা এই নিয়েই আছি। ....বড়ো 'ম্যাক্ সীজন্' চলেছে, মশায়। দু'টি পরিবার আছেন, আর আপনি এলেন। বৃহৎ পরিবারের একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে থাকার বন্দোবস্তও এখানে আছে।

অশনি বলিল,—মনোরম ব্যবস্থা।

শৈলমূলস্থ এই উদ্ধারণপুরে, এই রেষ্ট হাউসে, জনতা হইতে দূরে, আর, মনোরম ব্যবস্থার ভিতর, দেড়টি দিন অশনি রায়ের একেবারে

অকুতোভয়ে, অপরিসীম শান্তিতে এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কাটিল। ম্যানেজার নেহাৎ ব্যবসাদার—পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য, আর, বনানীর নিবিড়তা তাঁহাকে স্পর্শ করে না ; তবু তিনি আছেন ভালো···

অশনির মনে হয় এই নির্জ্জনতা আর নীরবতা ভূগর্ভস্থ কবর নহে, আকাশময় নির্লিপ্ততা ; বায়ুহীন শূন্যে এই আবাস নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানেরই আত্মনিমগ্নতা, চিরস্থিরতা, আর ইথারীয় একটা স্থির দীপ্তি দিয়া, আর, নিঃসঙ্গ ধ্যানের একটা গরিমায় মণ্ডিত করিয়া কে বা কাহারা যেন ইহাকে উদ্ধারণপুরের শৈলমূলে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়াছে। তাজমহলের মতো এটাও একটা নিখুঁত কবিতা···

অশনি রায়ের লোভ হয়, কবিতার প্রাণদ সেই স্বত্বাধিকারীর করমর্দ্দন সে করে।

বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে কাহার রচনার ঊর্দ্ধতম আয়ু পঁচিশ বৎসর, অশনি রায় অধুনা তাহাই চিন্তাপূর্ব্বক নির্ণয় করিতেছে।

নিজের সম্বন্ধে তার ভয় নাই—এক শতাব্দী রাজত্ব সে করিবেই ; কিন্তু তাহার মতো, সে যেমন করিতেছে তেম্‌নি করিয়া, অন্তরের উত্তাপ আর অকপটতা, আর হৃদয়লীন মানবপ্রেম ওতঃপ্রোতভাবে বিকিরণ করিয়া যাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন না, কেবল প্রজ্ঞার প্রখরতা দেখাইতেই আগ্রহবান্, তাঁহাদের আশা নাই—তাঁহাদের জীবনকাল খুবই কম—বিশ-পঁচিশও নয় ; কারণ, সাহিত্যে বুদ্ধি থাকে নিষ্ফলা হইয়া ; প্রসাদ এবং প্রভাব বিতরণ দ্বারা যে নিজেকে ক্রমাগত স্ফুটতর করিয়া উদ্ভূত করিতে থাকে সে হইতেছে হৃদয়। বুদ্ধি বোনে তর্কের জাল, হৃদয় পান করায় রস। হৃষীকেশ হৃদয়েই বাস করেন, মস্তিষ্কে নয়—

ভাবিয়া অশনি রায় নির্ভয় হইয়া গেছে—তার মতো দীর্ঘজীবী

গণপতি ঘোষালও নয় ; গণপতির হৃদয় শক্তিহীন—সে মাথা খাটাইয়া কেবল সমস্যা আর দুর্গতের অবতারণা করিতেছে।

কিন্তু অশনির ও-সব চিন্তা অবান্তর—বিশ্রামের পোষাক···

আদত কাজেও সে এই সুযোগে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে—সেটা হইতেছে আর একখানি উপন্যাস, যাহা অধিকতর যুগান্তকারী হইবে। উপন্যাসের অঙ্কুর এবং পুষ্প, অর্থাৎ তার শুরু আর তার শেষ, সে হৃদয়স্থ হৃষীকেশের আবহাওয়ায় উত্তাপ আর প্রেম দিয়া মনোজগতে নির্ম্মাণ করিতেছে····

এখনো কলম ধরে নাই—প্রেরণার বেগে কলম ধরিবার অধিকার-লাভের সাধনায় সে যখন বিহ্বল তখন একদিন সহসা তার সাধনায় এমন একটা বিঘ্ন ঘটিয়া গেল যার তুল্য পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না।

স্থান নিস্তব্ধ ছিল—উপন্যাসের প্রসব-গৃহ ঠিক্ এম্‌নি নির্জ্জন, আর, পবিত্রভাবে শান্তিপূর্ণ হওয়াই দরকার ; কিন্তু তেমনটি একদিন রহিল না—প্রবল শব্দে ঝড় উঠিল যেন বায়ুমণ্ডল এক নিমিষেই আলোড়িত হইয়া কাজ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল····ভয়ে অশনির প্রাণ এতটুকু হইয়া গেল—অঙ্কুর এবং পুষ্প একই সঙ্গে নির্জ্জীব হইয়া উঠিল····

বেলা তখন তিনটা—অশনি চোখ বুজিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল ; ভাবিতেছিল, বেশ আছি···এমন সময় ঐ রেষ্ট হাউসেরই সম্মুখে নরনারীর কলরব শুনিয়া অশনি চোখ খুলিল···তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ধারে যাইয়া দাঁড়াইল ; এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ভয়ে মুখ তখনই টানিয়া লইল—দেখা গেল, বিপুল একটা জনতা নীচেকার হলে প্রবেশ করিতেছে।

অশনির সন্দেহ রহিল না যে, ভক্তবৃন্দ তার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া

তার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। এ কি কঠিন বিধাতা! তাহাকে কি বিশ্রামসুখ ভোগ করিবার আর নিভৃতে চিন্তা করিবার অবসর তিনি দিবেন না! বিখ্যাত হওয়ায় এ কি বিড়ম্বনা!

দম্ লইতে অশনি রায়কে চেয়ারে বসিতে হইল....

নীচে হইতে হাস্যস্রোত উপরে ছুটিয়া আসিতেছে....তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করে কি না শুনিবার জন্য অশনি উৎকর্ণ হইয়া রহিল....মনস্থ করিল যদি ওরা কেহ তা' করে তবে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া সে পলায়ন করিবে। কিন্তু ওরা সবাই উচ্চৈস্বরে কথা কহিতেছে—যেন হাটের গোল! তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করিয়া থাকিলেও শোনা গেল না।

সওয়া চারিটায় চা—

ঘণ্টা পড়িল—

চায়ের টেবিলে যাইবার পূর্ব্বে অশনি ঘরের ভিতর জোরে জোরে কয়েকবার পায়চারি করিয়া লইল। উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তার গা ঠাণ্ডা হইয়া আসে যেন।

সিঁড়ির অর্দ্ধেক নামিয়াই মোড় হইতে অশনির চোখে পড়িল, যেন ফোটা ফুলের বাজার বসিয়াছে!

চট্ করিয়া ঘুরিয়া অন্য সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া সে ম্যানেজারের অফিসে গেল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এঁরা সবাই 'মহানট ছায়াবীথি' লিমিটেডের শিল্পী প্রভৃতি; 'মায়াবী মদনের' শুটিং শেষ হইবার পর মাত্র সাত দিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন অবসর যাপন করিতে...

এই সংবাদ দিয়া সুর একটু তরল করিয়া ম্যানেজার জানিতে চাহিলেন;—দেখবার মতো, নয় কি?

ম্যানেজারের প্রশ্নের জবাব অশনি দিল না, দিতে পারিল না; তার

বুক তখন আরো দুরুদুরু করিতেছে। প্রত্যক্ষ ভক্ত এঁরা নন্; কিন্তু তাতে কি আসে যায়! শিল্পী এঁরা ত' বটেই! শিল্পীশ্রেষ্ঠের প্রতি শিল্পীর যে আকর্ষণ তা' বাস্তবিকই প্রচুর—আর, তা' কোন বাধা মানে না; আত্মনিক্ষেপ করিবেই।

অশনির আরো মনে হইল, স্বনামধন্যের কোনোদিকেই পা বাড়াইবার পথ নাই—সহিষ্ণুতার পরীক্ষা তাহাকে পদে পদে দিতে হয়।

কিন্তু চা খাইতেই হইবে—

নিতান্ত ভীরুর মতো হলে প্রবেশ করিয়া অশনি একখানা চেয়ারে বসিল; প্রথমতঃ সে মুখ নামাইয়া রহিল; তারপর ছায়াচিত্রের অনুকরণে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে শিল্পীগণের দিকে নেত্রপাত করিল....

অশনি জানে, চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক রকম শিল্পীর প্রয়োজন আছে; যথা: প্রচার-শিল্পী, প্রাচীর-শিল্পী, প্রয়োগ-শিল্পী, নাট্য-শিল্পী, সঙ্গীত-শিল্পী, শব্দ-শিল্পী, পট-শিল্পী, চিত্র-শিল্পী, রসায়ন-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, পরিকল্পনা-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, প্রসাধন-শিল্পী, মঞ্চ-শিল্পী, রূপায়ন-শিল্পী, ইত্যাদি....এই সমুদয় শিল্পীদের আবার সহকারী ও সহযোগী শিল্পী থাকেন, এবং থাকেন নক্ষত্র, অগণিত নক্ষত্র। এঁরা তারাই।

পর্দ্দার বাহিরে সুন্দরতর কায়াময় সজীবতার অভ্যন্তরে ইঁহাদের দেখিয়া অশনি রায় মুগ্ধ হইয়া গেল; নরনারীর একত্র সমাবেশের দ্বারা স্ফূর্ত্ত জীবনের এই চাকচিক্যময় অভিব্যক্তি, আর, প্রাণের এই অনর্গল নির্গমশীলতা তাহার বড় ভালো লাগিল....

নীরবতা আর নির্জ্জনতা ভালোই, কিন্তু এ-ও বেশ, যদি তাহাকে নাড়া না দেয়।

—মশায় একা বসে' আছেন, এদিকে আসুন না!

অশনিকে নাড়া দিয়া জনৈক শিল্পী আহ্বান করিলেন।

অশনি ঐ দিকেই তাকাইয়া ছিল; এই আহ্বানে কেবল আহ্বান-কারীকে নয়, ওঁদের সবাইকে সে যেন আরো স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল; বেশভূষায়, আর, দেহের আপাদমস্তকে, আর কথোপকথনে, এমন কি বঙ্কিমভঙ্গিম মৃদু হাসিটিতেও, এমন নিঃসন্দিগ্ধ মসৃণতা অশনি আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। একেবারে কাছে ঘেঁষিয়া গেলে যদি মায়া নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া অশনি নড়িল না; বলিল.—আমি এখানেই থাকি। আপনাদের সঙ্গেই ত' আমি আছি!

—বেশ। আপনার নামটি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ধৃষ্টতা মাফ ক'রবেন। একা তরুণ আপনি এই নির্জ্জনবাসে এসেছেন দেখে' জিজ্ঞাসা করছি।

শুনিয়া অশনির মনে হইল, লোকটা ভারী চতুর; কি-কারণে উহাকে চতুর মনে হইল তাহা অশনি জানে না; কিন্তু ব্যক্তিটিকে চতুর মনে করিয়া সে একটু সঙ্কুচিত হইল···

এবং তারপর, টানিয়া-বুনিয়া নয়, অত্যন্ত সোজা স্বাভাবিকতারই সহিত তার মনে হইল, এমনও হইতে পারে যে, তাহারই একটি গল্পের কথা-রূপকে ছায়া-রূপ দিবার পরিকল্পনা চলিতেছে; সত্বাধিকারী একেবারে নাছোড়বান্দা—তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন: "অশনি রায়ের গল্পকে পর্দ্দায় ফেলতে পারলে তোমরা ধন্য হ'য়ে যাবে; টাকা রাখার ঠাঁই পাবো না।"

এতগুলি লোক—পুরুষ এবং নারী—সহসা সেই অশনি রায়কে সম্মুখে পাইয়া প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে, তারপর প্রচণ্ড আনন্দে সবাই

কলরব করিয়া উঠিবে; তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আর চেষ্টা পূর্ব্বাপর ওঁদের যে কতো ছিল তাহাই ওঁরা আগে আর সবেগে বলিবার প্রতিযোগিতাসহ প্রত্যেকেই বলিবেন—মহিলারাও বলিবেন····

চলচ্চিত্র-শিল্পী আর কথা-শিল্পীর প্রেরণার উৎস একই না বিভিন্ন, ইহাই লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে চাহিবেন····

বলিল,—আমার নাম অশনি রায়।

—অশনি?

অতর্কিত দর্শন-ব্যাপারের প্রবলতম বিস্ময় আর চমৎকারিত্ব সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি ওদিক্ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর, সে-চীৎকার অশনির বুকে পড়িল মুগুরের মত—আঘাত হিসাবে নয়, ওজন হিসাবে তা' বেজায়। অশনি মূঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল····

কিন্তু ব্যাপার তা' মোটেই নয়—অশনি যা' ভাবিয়াছে তা' নয়; সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত নয়। যিনি অশনি বলিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, চীৎকারের পর তিনিই বলিলেন অন্য কথা; বলিলেন,—না, সে-অশনি নয়। আমাদের সঙ্গে এক অশনি পড়ত' পাঠশালায়। অশনি কোন্ 'শ'?

অশনির হুঁশ ফিরিতে দেরী হইল—

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল,—যা' শাস্ত্রসম্মত—তালব্য শ।

—কিন্তু আমাদের সেই অশনি লিখ্ত' অশাস্ত্রীয় দন্ত্য স দিয়ে। পণ্ডিতের এত মা'র খেয়েছে তবু সে দন্ত্য স ছাড়েনি'!

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল···

অশনি লক্ষ্য করিল যে, শিল্পীগণের হাসি মামুলী ধরণের নহে, অর্থাৎ প্রবল হইলেও যথেচ্ছাচারিতার সহিত বিস্তৃত নহে; একটা আর্টসম্মত

পরিধি এবং পরিমিতির ভিতরেই সুষ্ঠু লালিত্য আর সৌকুমার্য্যের সহিত তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে—কান পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।

অশনিও হাসিল—

শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত একগুঁয়ে যে সহপাঠী তালব্য শ-এর স্থানে কেবলি দন্ত্য স বসাইতে পারে তাহার কথায় না হাসিয়া উপায় নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে অশনির ইহাও মনে হইল যে, ইহাদের হাসির তুলনায় তাহার হাসি নিতান্তই স্থূল, অনভিজাত, আর গ্রাম্য।

তৃতীয় ব্যক্তি একটি সুন্দরী মহিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মিস ভার্জ্জিন, তোমার গার্হস্থ্য নাম ত' সুবসনী—কোন্ শ?—বলিয়া তিনি দৃষ্টি শ্লথ করিয়া রাখিলেন—মহিলার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে সটান্ তাকাইয়া থাকা মার্জ্জিত-অবয়ব শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সুবসনা বলিলেন,—সোয়ামীতে যে স, সেই স।

—সোয়ামীর কথা আর বলো' না, লক্ষ্মী! আমাদের গুরুলোক হলিউডের আচরণে সোয়ামী কথাটার ওপরেই ঘেন্না ধরে' গেছে।

ওঁদেরই সমীপস্থ আর-একজন বলিলেন,—স্বামী আর স্ত্রী, দুই-ই দন্ত্য স। কিন্তু পর-পর ঐ দন্ত্য স প্রয়োগের ফল হয়েছে এই যে, দুনিয়ার স্বামীস্ত্রীতে বনিবনাও হ'চ্ছে না।

শুনিয়া একটি সুন্দরী বড় আহতা হইলেন; ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, —অবাক্ করলেন, কামিনী-বাবু। তার মানে?

কামিনীবাবুর নাম প্রাচীরগাত্রে রঙ্গিন অক্ষরে কবে যেন দেখিয়াছে বলিয়া অশনির মনে হইল।

কামিনীবাবু বলিলেন,—মানে এই যে, দন্ত্য স-এর ঐ অপরিমিত ব্যবহারের দরুণ স্বামী দেখায় দন্ত, আর স্ত্রী আসে দন্ত মেলে' কামড়া'তে।

দম্ভপ্রশস্তি শুনিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিল, পূর্ব্বোক্তরূপে আর্টের আইন লঙ্ঘন না করিয়াই।

তারপর একজন বলিলেন,—যে যা'-ই বলো, মিস্ রঙ্গিলা না এলে কিছুই ভাল লাগ্‌বে না। বলিয়া তিনি অরুচির অপরূপ একটি ভঙ্গী এম্‌নি করিয়া মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন যে, অশনির মনে হইল অভিনয় সার্থক হইয়াছে।

দক্ষিণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া একজন সে কথাব জবাব দিলেন; বলিলেন,—সে আস্‌বে শ্রীমান প্রেমেশেব সঙ্গে।

…কথার উপর কথা আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া আর ফেনায়িত হইয়া হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল। সবাই খুব চঞ্চল, কাঠবিড়ালীর চাইতেও চঞ্চল, প্রজাপতির চাইতেও চঞ্চল….মালঞ্চেব সবগুলি ফুল সবগুলি দল মেলিয়া শোভাব আর সুখেব চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল।

অশনির মনে হইতে লাগিল, সে-ই কেবল অচঞ্চল, অপ্রস্ফুটিত—তার ঔজ্জ্বল্য নাই·· সে, জলজ্যান্ত মানুষ একটা, যে এখানে বসিয়া আছে তা' যেন ওদের চোখেই পড়িতেছে না!

চা-পান শেষ হইল এতক্ষণে—

অশনি উঠিয়া দাঁড়াইল; বাহিরে যাইবার দরজার কাছে গেল; সেখানে দাঁড়াইয়া তার একটি সিগারেট ধরাইবার ইচ্ছা হইল; সিগারেট একটি প্যাকেট্ হইতে বাহির করিয়া সে দুই ঠোঁটের ভিতর গুঁজিয়া দিল খুব আল্‌গাভাবে; কিন্তু তখনই সিগারেট ধরানো তার বরাতে ছিল না—

দিয়াশলাইয়ের কাঠি টানিয়া বাহির করিবার সময়টিতেই ঘটিল এক ব্যাপার—ব্যাপারটি রূঢ়, সন্দেহ নাই….

ঠোঁটে সিগারেট, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, বাঁ হাতে দিয়াশলাইয়ের বাক্স,

বাক্স খানিকটা খুলিয়া সে কাঠি টানিয়া লইতেছে, হঠাৎ পিছন্ হইতে একটা ঠ্যালা খাইয়া সে সর্ব্বাঙ্গে নড়িয়া গেল···

অপর যে ব্যক্তি ঐ পথেই আসিয়াছে এবং যাহার গায়ের ধাক্কায় অশনির ঠোঁটের ভিতরকার সিগারেট টুপ করিয়া মাটিতে পড়িল চটিয়া গেল সে-ই—চটিয়া সে বলিল, "ধ্যাৎ"····

বলিয়া ভারি চঞ্চলতার সহিত সে বাহির হইয়া গেল····

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধমক্ খাইয়া অশনির কিছুই মনে হইল না, ইহা বলা চলে না—কিছু মনে তার হইলই; তার উপরে সে অনুভব করিল, চারিদিক্‌টা যেন বাষ্পাবরণে মলিন হইয়া উঠিয়াছে; এবং আরো ঘটিল ইহাই যে, সে শুনিতে লাগিল, কে যেন তার কানের কাছে দাঁড়াইয়া অতিশয় তাচ্ছিল্যের সহিত পুনঃপুনঃ বলিতেছে: "ধ্যাৎ"।

আশা এবং আমি

পাশের বাড়ীর ষোড়শী কুমারী শ্রীমতি আশাকে আমি, শ্রীবিভূতি, একেবারে নিজস্ব করিয়া পাইতে চাই—বিবাহ হইতে পারে না, তবু চাই। ···বিবাহও ত' সেই ব্যাপারই! বিবাহ একটি নারী এবং একটি পুরুষকে পরস্পরের একেবারে নিজস্ব করিয়া পাওয়াইয়া দেয়।

আশা আমার প্রতিবেশিনী—

আর, খুব নিকটে সে বাস করে, কিন্তু কেবল ঐ অবারিত অবস্থিতির সুযোগই আমার এই পাইতে চাওয়ার কারণ নয়—কারণ তদতিরিক্ত এবং নিগূঢ়···

কারণ এই যে, আশার সঙ্গে দৃষ্টিতে দৃষ্টি সন্নদ্ধ হইয়া এবং পুনঃপুনঃ সপ্রীতি আর সম্মতিসূচক দৃষ্টি-বিনিময়ের পর আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত, ভবিষ্যৎ অন্তহীন ও প্রোজ্জ্বল, আর চিন্তারাজ্য সুসম্বদ্ধ ভাবগৌরবে অভূতপূর্ব্বভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে···

ভাবিয়া দেখিয়াছি, সামগ্রীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি—মানুষের মনে চিরকাল তা' দুর্ব্বার হইয়া অবস্থান করে। ····শিশুর কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়: মায়ের পেটে ভাই কি বোন্ জন্মিলে তার প্রতি শিশুর ঈর্ষা কত! এত ঈর্ষা যে, অনিষ্টের ভয়ে লোকে সাবধান হয়। মা একেবারে নিজস্ব হইয়া ছিলেন; আর-একজন আসিয়া সেই অধিকারে চ্যুত আর সেই আনন্দে বঞ্চিত করিবে, এই ভয়েই না শিশুর ঈর্ষা! মাতৃস্নেহের রস কি কি উপাদানে প্রস্তুত তা' জানি না; কিন্তু শিশুর মত নিজস্ব মায়ের কেউ নয় বলিয়াই শিশুর প্রতি মায়ের এত টান···

উদাহরণ আরো আছে—

এবং অনুভব সবাই করে যে, লোভের বস্তুর ভিতর মানুষের সেই সত্তা অদম্য হইয়া প্রবেশ করে, নানা দিকে প্রসারিত সত্তার যে অংশটুকু তার প্রিয়তম—যাকে সে কায়মনোবাক্যে লালন করিয়া সঞ্জীবিত, তুষ্ট তৃপ্ত সুখী করিতে চায়....না পাইলে মনে হয়, সত্তার শ্রেষ্ঠতম অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া, শূন্যে মিলাইয়া, জীবন ধারণের উপকরণ আর আকাঙ্ক্ষা ঠিক ততখানি নষ্ট হইয়া গেল।

এ-সংসার ভোজবাজি, মায়ার খেলা, দারাপুত্রপরিবার কেউ কারো নয়, ইত্যাদি খেদের মূলেই আছে এ অনুভূতি যে, নিজস্ব কিছুই হয় নাই, সত্তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, বঞ্চিত হইয়াছি—অতএব কেহ কাহারো নহে, আসল বস্তু কিছুই নাই। এই যন্ত্রণাকর বঞ্চনা আর হতাশার যারা মূল, অর্থাৎ দেখা যায় যারা নিজস্ব হয় না, তাহাদের কেবল পর নয়, পরিত্যাজ্য শত্রু মনে করিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কেউ তা' করে না—উপরন্তু নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে খুনোখুনি করে—বাধায় যুদ্ধ।

এই সব চিন্তা অকাট্য হইয়া আমার মনে জাগে—চিন্তাগুলিকে আমি ভালবাসি...

বিবাহ আমি করি নাই; কিন্তু জানি যে, বিবাহ অতিশয় ভদ্র, সামাজিক, এবং প্রচণ্ড রবে বিঘোষিত পবিত্র অনুষ্ঠান; কিন্তু ইহাও জানি যে, মূল ইচ্ছাটা ধর্ম্মপালন নয়, নিজস্ব করিয়া পাওয়ার। সবাই জানে যে, নিজস্ব করিবার উদ্যমের নামই প্রেমাকাঙ্ক্ষা, নিজস্ব হইয়া থাকার নামই দাম্পত্য ধর্ম্মপালন, এবং নিজস্ব করিয়া পাইবার পর আচরণের বাহিরের পিঠ্‌টা মার্জ্জিত রাখিতে পারিলেই লোকে দেখে, প্রণয় হইতে দ্যুতি নির্গত হইয়া স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছে....

কিন্তু তর্কাতীত অব্যর্থ কথা এই যে, আশার প্রতি অঙ্গের জন্য আমার প্রতি অঙ্গ কাঁদিতেছে। কেবল কাঁদিতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়—বলিতে হইবে যে, কান্নার সঙ্গে প্রতি অঙ্গ কাঁপিতেছে, তীক্ষ্ণ উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে....

আশাকে আমি ভালোবাসি, যদি ভালোবাসার নাম হয় তার দেহটাকে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার ইচ্ছা। দৈহিকভাবে ধরা দিবার আগে ছোটে মন—মনে মন বাঁধা পড়িয়া দেহ হয় পদলুণ্ঠিত বা কণ্ঠলগ্ন। আশার মন আমি পাইয়াছি, আবিষ্কারের পর অধিকার করিয়াছি ; কিন্তু নিরাকার মন কিছুমাত্র উপভোগ্য নয় যদি রূপময়, ভোগায়তন, আর সুখাবহ বস্তু-গৌরবে গরীয়ান্ দেহ থাকে স্পর্শাতীত অনধিগম্য হইয়া...

সে বড় যন্ত্রণা।

মনে পড়ে জীবনের আগেকার কথা। বর্ত্তমানে আমার চিন্তারাজ্য সমৃদ্ধ বটে ; কিন্তু ভৌতিক রাজ্য সমৃদ্ধ কোনো কালেই ছিল না, এখনও নয় ; তার মানে এই যে, চিরকালই আমি সামগ্রীহীন, বুভুক্ষু ; নিজস্ব করিয়া আজ পর্য্যন্ত এমন কিছুই পাই নাই যার স্মৃতি স্মৃতির রাজ্য সমৃদ্ধ করিতে পারে, এমন কি উৎফুল্লকর হইতে পারে....

শৈশবের কথা মনে নাই—

শৈশবোত্তীর্ণ বয়সে খেলার সাথী মিলিয়াছিল—নিজস্ব সম্পদ হিসাবে তারা গণ্য হইলে অন্তরীক্ষবিহারী পক্ষীও আমাদের জীবনের সম্পদ। কৈশোরে পঠদ্দশায়—কই, কিছুই ত' মনে পড়ে না ! এমন কোনো অতি সুন্দর দুর্লভ মূল্যবান সামগ্রী এমন অবিসম্বাদিতভাবে আমার অধিকারভুক্ত হইয়া যায় নাই যাহাকে স্মরণ করিলে মন সরস হয়।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইতে

থাকে—মায়ের জন্য প্রকোষ্ঠ; পিতার জন্য, সহোদর সহোদরার জন্য, স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য, ইত্যাদি, বহু····

আমার অন্তরেও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল—আর একটি প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়া উঠিল আশার জন্য····অনুত্তরণীয় অনবদ্য, নিভৃতির সুখে শিহরিত, মধুস্রাবী সে প্রকোষ্ঠ,—সকল প্রকোষ্ঠের মধ্যমণি—

এই প্রকোষ্ঠে আশা বাস করিতেছে···

আমার সকল শিরার টান সেই দিকে, সকল অমৃত রস প্রবেশ করিতেছে সেখানে, আমার সকল জগৎ মদাক্রান্ত হইয়া অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করিতেছে তাহাকেই ঘিরিয়া—

এবং আমার চিন্তারাজ্য ভাবগৌরবে আরো সমৃদ্ধ হইতেছে সেই উপলক্ষ্যেই···

পাপ পুণ্য বলিয়া সংসারে কিছু নাই। মানুষের সহজাত আর সঞ্চিতগত অপরিহার্য্য হইয়া পাপ পুণ্যের যে-বিচার চলিয়া আসিতেছে তাহা শোনা বা পড়া কথার ছাঁচে গড়া সংস্কার মাত্র। পাপ করিলে নরক, পুণ্য করিলে স্বর্গ; কিন্তু একটু চোখ খুলিলেই দেখা যাইবে যে স্বর্গ নরক ইহলোকেরই রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। এমন হাস্যোদ্দীপক কল্পনা মানুষ কোন্ বুদ্ধিতে করিয়াছিল জানি না। নরকে প্রচণ্ড দুস্তর অগ্নি আছে, অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিপ্রবাহ, অগ্নি-শলাকা আছে; কারণ, অগ্নির তাপ আমরা সহ্য করিতে পারি না। নরকে কণ্টক আছে, অঙ্কুশ আছে; কারণ এগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর শরীরে বিঁধিলে এখানেও তা' যন্ত্রণাদায়ক।····তবে স্বীকার করি যে, কাহাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার অধিকারে বঞ্চিত করিলে তাহাই হয় নিয়মভঙ্গের কাজ, সুতরাং আপত্তিজনক। কিন্তু আমি চিন্তাপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আশাকে যে-ব্যক্তি লোকাচার পালন করিয়া নিজস্ব করিয়া

লইবে সে-ই করিবে নিয়মভঙ্গ, অর্থাৎ অধিকারে হস্তক্ষেপ, কারণ, আশার ইচ্ছা আমাকে পাওয়ার, এবং সেই কারণে আশার উপর আমার অধিকার জন্মিয়াছে। সতেজেই বলিতে পারি, আমার আত্মা তাহাকে চায়, তাহার আত্মা আমাকে চায়....

আত্মায় নাকি ভগবানের বিভূতি বিরাজ করে....আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়, কিংবা আসামী হইয়া বিচারের পর দণ্ডভোগ করে! মিথ্যা কথা। যান্ত্রিক যে-ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম ও জটিলতম বিলয় বিকাশ উৎপত্তি রক্ষণ পুষ্টি শোধন সঞ্চালন ধ্বংস অবিরাম চলিতেছে, আত্মাও সেই বিস্ময়কর সচলকারী যন্ত্রেরই সৃষ্ট একটি পদার্থ—তা' এত সূক্ষ্ম স্নায়ুসমষ্টি যে তার অবয়ব চোখে দেখা যায় না। কেবল মস্তিষ্ক কি হাত পা কি হৃদ্‌পিণ্ড দেহের বাহিরে যাইয়া যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না, ঠিক্ তেমনি পারে না আত্মা—মৃত্যুকালে সে বায়ুর মত কি পুত্তলিকার আকারে নির্গত হইয়া যায় না—জীবনবাহী অপরাপর যন্ত্রের মত তার, সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য স্নায়ুসমষ্টিরও, ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়...

এই যদি হয় ব্যাপার, তবে আত্মার অধোগমন, উর্দ্ধে প্রয়াণ, নরকস্থ হওয়া, স্বর্গবাস, ও যোনিভ্রমণের ক্লেশ, ইত্যাদি উত্তর ফল বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনা রহিল কই!

কাজেই ও-সব ভয় করি না—

কেবল আকাঙ্ক্ষা করি আশাকে সশরীরে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার।

অন্য একটা দিকে দৃষ্টি ফেলিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়া একান্ত আমারই জন্য পৃথিবীর যে-স্থানটুকু ছাড়িয়া দেওয়া আছে তা' সঙ্কীর্ণ—এত সঙ্কীর্ণ যে চলিতে ফিরিতে গায়ে ঘর্ষণ লাগে; বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে....

তারপর অধিকতর স্বচ্ছভাবে আরো চিন্তাশীল হইলে ইহাও

অনুভূতিতে পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়া গেল যে, আশাকে পাইলে আমি বিচরণের যে ক্ষেত্র পাইব তাহার বিস্তৃতির সীমা নাই ; আকাশে পাখীর উড্ডয়নের স্থান যেমন অসীম আমিও পাইব তেম্‌নি অসীমতা—উদ্দাম সঞ্চরণের অনন্ত অবকাশ আনন্দ আর স্থান।

আরো খানকতক পত্রবিনিময়ের পর আশাকে লইয়া আমি পলায়ন করিলাম....দূর শূন্য হইতে একাগ্র শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে-কপোতীর মাংস আমি প্রাণপণে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম তাহা আমার নিজস্ব হইল ....আশা তাহার মাংসপুঞ্জ নৈবেদ্যের ফুলের মত লঘু আর ভক্তিপূত করিয়া আমার সেবার্থে নিবেদন করিয়া দিল....

আশা তেমন সুন্দরী নয় ; তার প্রতি অপরিসীম পক্ষপাতিত্ব করিয়াও বলা চলে না যে, সে গৌরবর্ণা, আর তার নাক ভালো। আশার চোখের চাহনি যেন ঢিলে, একটু বিব্রত বিষণ্ণ ধরণের কিন্তু হাসিলে তার চোখ ভারি মধুরভাবে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে ; ঠোঁট দু'খানা লাল টুকটুকে—যখন কথা বলে তখন সাদা দাঁতের পৃষ্ঠপটে সেই কথার লহরী ধাক্কা খাইয়া অধরে যেন জ্যোতির্ম্ময় অমিয়ধারা ঝরিতে থাকে...

কিন্তু আমার চাহিদা হিসাবে রূপ তেমন বিবেচ্য নয়, যেমন বিবেচ্য একটি আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীকে, যৌবনপুষ্ট সুস্থ নিটোল দেহটাকে, আমি নিজস্ব করিয়া কতখানি পাইলাম !....হাস্যপূর্ব্বক স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেদিক দিয়া আশা আমাকে একবিন্দু অপরিতৃপ্ত রাখিল না— প্রথম দিনেই সে চমৎকার নিষ্ঠা আর শারীরিক প্রগল্‌ভ উৎসাহের সঙ্গে ধরা দিল... আমার মাংসলোলুপ আর বহু দিনের ক্ষুধাপীড়িত মনের

সে ক্ষিপ্ত উল্লাস আর উৎক্ষেপের তাড়নায় পৃথিবী যেন শিবের তাণ্ডবে অন্ধকার হইয়া গেল—চৈতন্যে আগুন ধরিয়া গেল যেন···যেমন করিয়া ইক্ষুর রস মুচড়াইয়া বাহির করা হয় তেম্‌নি করিয়া জীবনের সবটুকু রস নিংড়াইয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। আশাও তৃপ্ত দানশীল হইয়া আমাকে মুহুর্মুহুঃ ঝলকে ঝলকে অমৃত পান করাইয়া অজ্ঞান সমাধির পর যেন অমরত্ব দান করিল।

কিন্তু আমার চিত্ত যে এমন অব্যবস্থিত তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, রাত্রির জাগরণ আর অপরিমেয় উৎসবের পর সম্মুখে আতস-বাজির ছাই ছাড়া কিছু নাই, অর্থাৎ সকাল বেলা উঠিয়াই আশার দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইল, বহু পূর্ব্বেই জলন্ত ইন্ধনে ভস্মসাৎ হইয়া কতকাল যে এই নারী আমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহা যেন মনে করিতেই পারি না····এ অতি পুরাতন ; ইহাকে নিজস্ব করিবার উদ্দামতা একেবারে শান্ত নিমজ্জিত হইয়া গেছে ; এবং আমার নিজস্ব হইয়া আমাকে যা' দান করিবার ছিল তাহা নিংড়াইয়া নিঃশেষে দান করিয়া এ নিঃস্ব অসার অপ্রয়োজনীয় হইয়া গেছে····

মনে হইতেই ভারি চমকিয়া উঠিলাম।

কৈফিয়ৎস্বরূপে বলিতে পারা যায়, দূরবর্ত্তিনী আশা যে-স্বপ্নের সৃষ্টি করিত সে-স্বপ্ন আর স্বপ্ন নয় এখন, জাগ্রত জগতের মূর্ত্তিমান ব্যাপার। বাতায়নে, সার্শির কাচের ওপিঠে দাঁড়াইয়া, অর্থাৎ একটা অজ্ঞাত লোক হইতে যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কল্পনার কারুকার্য্য-বিশিষ্ট অপ্সরীর মত আশা দুর্ব্বার হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিত, ইন্দ্রজালের সে চাতুরী, কারুকার্য্য, কুহেলিকা, আর চঞ্চল মায়া এখন বিতৃষ্ণাজনক আর কুরূপ স্থূল শরীরে সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেছে····

নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আমার মন আমি জানি; তা-ই ত' সব নয়!

সামগ্রীকে নিজস্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে কেমন স্বাভাবিক তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত এবং ব্যাখ্যা করিয়াছি; কিন্তু তখন বলি নাই যে, মানুষের মনের গতি স্বাভাবিক-ভাবেই যেমন জীর্ণ-সংস্কারের দিকে, তেমনি নূতনের দিকেও থাকে—নিজস্ব করিয়া পাওয়ার মতো, সামগ্রীকে পুরাতন মনে হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনূতন সামগ্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের কম প্রবল নয়। মনে মনে অবহিত হইয়া একটুখানি চেষ্টা করিলেই যে-কোন ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, শৈশব হইতেই মানুষ নিত্য-নূতন পাওয়ার লোভে অস্থির আর অভ্যস্ত হইতে থাকে…

নূতন নূতন খেল্না পাইবার বায়না হইতে শুরু করিয়া পুরাতন বই টান্ মারিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন বই কিনিবার আনন্দ আমাদের মনে নাই কি! ছেলেবেলাকার নূতন কাপড় পাওয়ার আনন্দ, নূতন কাপড় পরিলেই এখনো যেন জাগে।…অভ্যাসটা যায় না—থাকেই। সেই শৈশবাগত অভ্যাসের বশেই মানুষ বেশী দামী জিনিস যা' অকেজো হয় নাই তার বদলে অল্প দামের নূতন জিনিস আহরণ করিতে পারে; রং লাগাইয়া পুরাতনকে নূতন করে…

নূতন নূতন অলঙ্কারে আর বস্ত্রে পুরুষ নারীকে সজ্জিত করে নূতন বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত না হউক দমন করিবার অভিপ্রায়ে… সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর প্রতি প্রণয় গাঢ়তর হয়, পুরুষ নূতন করিয়া আসক্ত হয়, স্ত্রীকে নূতন পরিবেশের অভ্যন্তরে নূতন রূপে পাইয়া।

ঐ কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া কেহ অস্বীকার করিলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে না; কিন্তু আশা একদিনেই পুরাতন হইয়া উঠিবে, এবং তাহাকে

লইয়া সীমাহীন উন্মুক্ত বিশ্ব-ভবনে বিহার আর বিচরণ করিবার উগ্র উষ্ণ দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা একদিনেই এমন নিস্তেজ শীতল হইয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ভাবিতে যখন পারিলাম তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না—আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এমনি অভ্যাসের দাস!

কিন্তু আশাও বড় বেশী গা-ঘেঁষা—স্পর্শ ত্যাগ করিতে সে কিছুতেই দিবে না—

আমার গা নড়িলেই যেন আঁৎকাইয়া ওঠে; বলে,—ও কি, উঠ্‌ছ' যে?

বলি: উঠ্‌ছিনে।

ঠেলিয়া যদি উঠিতে চাই তবে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলে,—কোথায় চল্‌লে?

—এখানেই আছি, যাবো না কোথাও।

তারপর আশার আর্ত্ততা দেখিয়া নিবিড় একটা মমতা জন্মে; ঢোক্ গিলিয়া বলি,—তোমাকে পেলাম, আশা!

আশা যেন ধন্য হইয়া যায়—

উদ্বেল আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া বলে,—আমিও তোমাকে পেলাম। তুমি আর আমি····

যেন দুনিয়ায় কোথাও আর এমন কেউ নাই যাহাকে আশা আর আমি চাই। আমরা দু'টিতে মিলিয়া একটি সত্ত্বা।

আশাকে আবার মিষ্ট লাগে—হঠাৎ একটু যেন নূতন করিয়া তাহাকে পাই····

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশাকে লইয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বে আমার খুব প্রাণপ্রদ সতেজ উৎসাহের সহিত মনে হইত, এই বিপুল বিশ্বে স্বাধীন আনন্দে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিব আশা আর আমি। সে-ও যে মনে

মনে অত ব্যাপক আর প্রগাঢ় কল্পনা করিয়া বসিয়া আছে তাহা জানিতাম না।

তার মুখে "তুমি আর আমি" শুনিয়া ভারি মুগ্ধ হইলাম; প্রেমের মন্ত্র-শক্তিতে স্থান-কাল বস্তু পুনরায় সীমাহীন হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইল; এবং তার মুখের কথার মাধুরী মাখিয়া তার দেহ তৎক্ষণাৎ আমার চোখে মধুময় হইয়া উঠিল....

আশাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বলিলাম,—হ্যাঁ, আশা, তুমি আর আমি।

আশা আমার বুকের উপর মুখ রাখিয়া গা ঢালিয়া দিল।

বৈকালে বলিলাম,—আশা, চলো বেড়িয়ে আসি।

প্রস্তাবটা ভয়ঙ্কর বা উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নয়; কিন্তু আশা চম্‌কিয়া উঠিল; বলিল,—কোথায়?

—এই রাস্তায়।

—যদি তুমি হারিয়ে যাও! বলিয়া আশা অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম,—না, না, হারাবো কেন? পাশাপাশি চল্‌ব' দু'জনে।

—চলো। বলিয়া আশা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া কিন্তু ভারি বিড়ম্বনায় পড়িলাম—বলিয়াছিলাম, দু'জনা পাশাপাশি চলিব, তাহা হইলেই হারাইবার ভয় থাকিবে না; কিন্তু কাজেকর্ম্মে দেখিলাম, কেবল পাশাপাশি চলিয়া আশা নিশ্চিন্ত নয়—সে আমার হাত ধরিতে চায়,—জামা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিতে চায়!

তার হাত ছাড়াইয়া দিতে দিতে চলিলাম। বলিলাম,—হাত ধরো’ না, জামাও ধরো’ না। লোকে তাকিয়ে দেখে হাস্‌ছে যে!

আশা বলিল,—তা’ হাসুক, হাস্‌ল’ ত’ বয়ে গেল। হারিয়ে গেলে এনে দেবে তারা?

কথা কহিলাম না।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি ত’ তাকিয়ে কিছুই দেখ্‌ছ না, আশা! কত নতুন নতুন, ভাল ভাল জিনিস রাস্তার দু’ধারে! ঘন ঘন আমার মুখের দিকে দেখ্‌ছ’ কি?

—দেখ্‌ছি বই কি দোকানের জিনিস। কিছু জিজ্ঞাসা করছিনে, তুমি যদি বিরক্ত হও!

—কিছু নেবে না?

—কি নেব?

—কত জিনিস কত দোকানে! কিছু কিন্‌তে ইচ্ছে হয় ত’ বলো।

—উঁ হুঁ। তুমি আরো সরে’ এস আমার কাছে—আমাদের ভেতর দিয়ে কাউকে যেতে দিও না—আমার ভারি গোলমাল লাগে। এত লোক এখানে!

আশার ইচ্ছা পালন করিলাম—তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিলাম, এবং এখানকার লোক সংখ্যায় এত কেন, এ-বিস্ময়ের জবাব দিলাম না....আর অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার চিন্তারাজ্যের বিস্তৃতি সার্ব্বভৌম পর্য্যায়ে উঠিয়া পুনরায় ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ হইতেছে।

বুঝিতে পারিলাম যে, দেহকে নিজস্ব করিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিকেও উপভোগ্য মনে না হইলে, আর, বুদ্ধিকেও বশবর্ত্তিনী করিয়া তুলিতে না পারিলে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে না। প্রেম সংলগ্ন করিয়া রাখে সত্যই, সে সাধ্য তার আছে। কিন্তু ইহাও একটি সত্য যে, মিলনে

বিরহে প্রেমের প্রকাশ যতই হৃদ্য হউক, সেই প্রকাশে অভিনবত্ব দেয় বুদ্ধি, দেহ নয়। যার বুদ্ধি নাই সে পুত্তলিকার মত একঘেয়ে। মানুষকে নিত্যই নূতন করিয়া তোলে তার বুদ্ধির দীপ্তি—বুদ্ধির দীপ্তিতেই ঘটে অপূর্ব্বত্ব আর রূপান্তর; অপূর্ব্ব রূপান্তর দেখিয়া জাগে বিস্ময়, আর নিমেষে নিমেষে নূতন করিয়া পাওয়ার উল্লাস....তার কৌতুক আর সত্তা ঝক্‌মক্ করে বুদ্ধির দীপ্তিতেই, আসে রসজ্ঞান, এবং আলাপ পরিবেশিত হয় রসপূর্ণ হইয়া।

আরও বুঝিলাম যে, পৃথিবী এখনো নীরস হইয়া পুরুষের পক্ষে বাসের অযোগ্য হয় নাই; নারীর ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে বলিয়া, আর, বুদ্ধি দিয়া নিজেকে সে সতর্ক শাণিত স্বতন্ত্র আর সজ্জিত রাখে বলিয়া।

কিন্তু আশার কেবল দেহই আছে, আর কিছুই নাই। খালি দেহকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তিষ্ঠিতে পারে কতক্ষণ!

আশাকে লইয়া পথে পথে প্রমোদ-ভ্রমণ শেষ হইল; এবং তাহাকে লইয়া যখন আমি বাসস্থানে ফিরিলাম তখন মনে মনে আমি তাহাকে চৌদ্দ আনা ত্যাগ করিয়াছি....উড্ডয়নশীল মন ভারাক্রান্ত হইয়া পাখা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে; পৃথিবীকে আশার দেহের সৌষ্ঠবে নবীন আর শ্রীযুক্ত, আর দেহের আলোকে উৎফুল্ল উজ্জ্বল অন্তহীন আকাশ মনে হইতেছে না। তখন আশাকে মনে হইতেছে পিঞ্জর, আর নিজেকে মনে হইতেছে সেই পিঞ্জরে বন্দী।

কাল রাত্রে বসিয়া বসিয়া শুইয়া শুইয়া আশার সঙ্গে যত গল্প করিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা কোনদিনই করিতে পারিব না···নেশার ঘোরে সেই অনর্গল আলাপ, আর আশার অর্দ্ধোচ্চারিত কথা এত

মধুর, এমন নূতন, এম্‌নি প্রাণময় মনে হইয়াছিল যে নিজেরই দিক ঠিক রাখিতে পারি নাই—কৃতার্থতায় আর তৃপ্তিতে একশোবার মনে হইয়াছিল, পৃথিবীতে যদি কেহ সুখী থাকে তবে সে আমি····

কিন্তু আজই, একটি অহোরাত্রেই, পৃথিবী যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া একটি জনমানবহীন শুষ্ক প্রান্তর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল—

মনে হইল, ভুল করিয়াছি····

ভাবিয়াছিলাম, আশাকে লইয়া সংসারের বৃন্তচ্যুত হইতে পারিলেই নিঃশ্বাসরোধকর সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর হইতে মুক্তি পাইয়া অসীম নভোমণ্ডলের অধিবাসী হইব; কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল, এই জীবনই সঙ্কীর্ণ—এত সঙ্কীর্ণ যে মুখখানা রাখিবার স্থান নাই। সেই জীবনই ছিল অবাধ অসঙ্কোচ প্রফুল্ল—কেহ কোনোদিন বলপূর্ব্বক টানিয়া নামায় নাই; বলে নাই, এই গণ্ডীর ভিতর তুমি থাকো····

—কি ভাব্‌ছ? আশা জিজ্ঞাসা করিল—অনুকম্পার সুরটি অনুভব করিলাম।

বলিলাম,—ভাব্‌ছিনা কিছু, আশা। তুমি কি ভাবছিলে এতক্ষণ চুপ করে'?

আশা কথা কহিল না—

দেখিলাম, চোখে তার জল আসিয়াছে·······

—বলো, কি ভাব্‌ছ!

—মায়ের কথা। বলিয়াই আশা আমার ডান হাতখানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, বটু আর মণির কথাও ভাবছি। তুমি তাদের কথা ভাবছনা?

আশা বিধবা মায়ের জ্যেষ্ঠা সন্তান; বটু আর মণি তার ছোট দু'টি

ভাই। এই নিঃস্ব বিধবাকে আর্থিক সাহায্য করেন তাঁর দেবর—আশার বাবার খুড়্‌তুতো ভাই।

আমি তাহাদের কথা ভাবি নাই—কাহারও কথাই ভাবি নাই—উন্মত্ত হইয়া কেবল ভাবিয়াছিলাম আশার কথা, আর তার প্রণয়ীরূপে নিজের কথা·········

কিন্তু এখন তাহাদের কথা মনে পড়িল—নিঃশঙ্ক পরিপাটি তাদের পারিবারিক জীবন—ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরেই তারা অম্লান স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিচরণ করে; তারাও ছিল আমার জীবনকে প্রসারিত স্নিগ্ধ করিবার সামগ্রী········

আশা তার মা আর বটু আর মণির সহিত যোগদান করিয়াই আমার জীবন-প্রদীপ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত—

তা' মনে পড়িল, আর নিঃশ্বাস পড়িল।

কিন্তু আশাকে নিজস্ব করিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে রসবাহী নাড়ীর যোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছি····আত্মার আলিঙ্গনের মধ্যে, আর আত্মাকে ক্রীড়াশীল করিয়া অসীমের দিকে তরঙ্গায়িত করিতে আপনার জন বলিতে যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সবাইকে ত্যাগ করিয়া বৃক্ষজননীর আশ্রয়ভ্রষ্ট ফলের মত অধোগামী হইয়াছি—কোথায় যাইয়া পড়িব তাহার কল্পনা করিতেও পারি না····

আশা চোখ মুছিল—

বলিল,—তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না ত'!

শুনিয়া সত্যই আহত হইলাম—

বলিলাম,—না, আশা; সে-ভয় কেন করছ?

পলায়ন করিবার কথা একেবারে ভাবি নাই এমন নয়; কিন্তু এ-সত্য যে অনিবার্য্য, আশা ভিন্ন আমার মুক্তির পথ নাই; যদি ঘরে

ফিরিতে হয় তবে আশাকে লইয়াই ফিরিতে হইবে, অথবা মরিতে হইবে—পথে পথে প্রেতের মত আমি বেড়াইতে পারিব না, আশাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও জন্মভূমিতে আমার স্থান নাই····

কেউ যেন বাঁধন কষিতেছিল ; কষিতে কষিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিল—নিষ্কৃতি পাইয়া গেলাম—

আনন্দে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আশাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিলাম, তার দেহকে নয়, দেহের অবলম্বনে আর স্পর্শে তার আত্মাকে—সেখানেই শান্তির একটা শুদ্ধ রূপ চোখে পড়িল····

বলিলাম,—তুমি মায়ের কাছে যেতে চাও, আশা ?

শুনিয়া আশা ভয়ে যেন শুকাইয়া উঠিল ; বলিল,—কিন্তু তুমি ?

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—

আশা একমাত্র আমাকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য, অত্যাজ্য আর উপাস্য করিয়া রাখিয়াছে ! মন গলিয়া যেন কণ্ঠ অবধি হিল্লোলিত হইয়া উঠিল····

আশার বুদ্ধি নাই, রূপ নাই ; কিন্তু ভুল নাই যে, সে আমারই ভিতর নিজেকে নিমজ্জিত মিশ্রিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—তার নির্ম্মল প্রাণের এই সুকোমল স্বাদুতা আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল····

বলিলাম,—আমিও যাব।

—তা কি হয় ?

—হয়, আশা ; বিয়ে করলেই হয়।

—তা' কেমন করে' হবে ! আমরা যে এক জা'ত নই।

—তা' না-ই বা হ'লাম !

—তবে তা'ই করো।

সে রাত্রে আশা অসীম মুক্তির মাঝে নূতনতর রূপ ধারণ করিয়া আবার আমার নিজস্ব হইল।

প্রতিক্রিয়া

প্রত্যুষে ক্রন্দনরোল উঠিতেই জানা গেল যে, রতিকান্ত সেন মারা গেল।

এই ক্রন্দনধ্বনিতে শোকের দাহের সঙ্গে মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বিষণ্ণ হইল সবাই—হইল না কেবল ঐ স্থানেরই হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গ্রামের বিশেষ গণ্যব্যক্তি এরাই দু'জন—রতিকান্ত আর হরেন্দ্র। রতিকান্ত গেল, হরেন্দ্র রহিয়া গেল।

রতিকান্ত এখন, ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে, মৃত ব্যক্তি, অর্থাৎ অতীত সত্তা; কিন্তু সবারই মনে থাকিবে যে, চিরকাল সে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে।

রতিকান্ত সেনের সঙ্গে কেহ কখনো সহজে পারিয়া উঠে নাই—উহাই ছিল তার প্রবল নিজস্বতা। যেমন সে চতুর ছিল, তেমনি ছিল দুঁদে, তেমনি হিসাবপটু, তেমনি পরিশ্রমী, আর তেমনি বৃহৎ, আকারে; গায়ে শক্তি অসাধারণ, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, বাক্য সংযত। কখনো সে হাস্যাস্পদ হয় নাই; অনুচিত কথা বলিয়া নিজেকে কখনো সে খর্ব্ব করে নাই; ছেঁদো কথায় নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তি তার কোনোদিনই হয় নাই; মানুষের বিপদে উল্লসিত হয় নাই; গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধায় নাই; কিন্তু বিবাদ বাধিলে ভয় কি আলস্যবশতঃ অল্পে নিরস্ত হয় নাই—শেষ করিয়া এবং শেষ দেখিয়া ছাড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে এই প্রকৃতির লোক কারো কারো পক্ষে যেন

অস্বস্তিকর—ক্ষীণজীবী সাধারণ লোকের সম্মুখে যেন একটা নিষেধ বিস্তার করিয়া প্রতিবন্ধকের মতো সে দণ্ডায়মান থাকে ; হাত তুলিয়া বাধা সে দেয় না ; তবু মনে মনে কঠোরভাবে বিচার করিয়া একটি লোক অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছে, ইহা ভাবিতে বাধ্য হইলেই ক্ষুদ্রের প্রাণে যেন নিকৃষ্টতার একটা কুণ্ঠার আবির্ভাব হয়। এই অনুভূতি যাহার জন্য, যে কাছাকাছি আছে বলিয়া, ঘটে তাহার সঙ্গে সে-কথা লইয়া তর্ক করা চলে না ; কিন্তু একটা পরাজয়বোধের দরুণ অপ্রসন্ন হওয়া চলে, এবং অন্য কোনো ছুতায় সে-অপ্রসন্নতা প্রকাশ করাও চলে....

যে কিছুই কহিতেছে না, কেবল ন্যায় অন্যায় লক্ষ্যপূর্ব্বক মনে মনে তুচ্ছ মনে করিতেছে, তাহাকে দুস্তর মনে হওয়া কারো কারো পক্ষে যেমন স্বাভাবিক তেমনি বিক্ষোভজনক।

এই কারণে একটা অকিঞ্চিৎকর বিরুদ্ধ পক্ষ রতিকান্তের বরাবরই ছিল ; রতিকান্তের কোন কোন কাজ অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া নিন্দা করাই ছিল তাদের অবসরের কর্ম্মসূচীর একটি দফা। ইহাদের প্রধান ছিল ঐ স্থানেরই হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রতিকান্ত নিন্দনীয় কাজ কিছু করে বলিয়া প্রমাণতঃ জানা নাই ; সে মিথ্যা কথা বলে না, সুদখোর নয়, অনর্থক চেঁচামিচি করে না, খায় ভালো, ছেলে দু'টি বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে, মেয়ের বিবাহ দিয়াছে অর্থবান লোকের ঘরে, অর্থাৎ রতিকান্ত সবাইকে ডিঙাইয়া গেছে—পারিবারিকভাবে সে একটা অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছে...

হরেন্দ্র নিজের কাছে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং হরেন্দ্রের তা সহ্য হয় না—তার মনে হয়, ঐ কারণে রতিকান্ত তাহাকে ঘৃণা করে। ঘৃণা তাহাকে রতিকান্ত করে কি না তা' জানেন রতিকান্তের অন্তর্য্যামী, সে ঘুণাক্ষরেও তা' কখনো প্রকাশ করে নাই।

হরেন্দ্রের জীবনযাত্রার ধারাটাই বাঁকা—অনেকের কাছেই সেটা একটা সাংসারিক কূটপ্রশ্ন; কিন্তু সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমাধানের জন্য রতিকান্তের কাছে কেহ কখনো আসে·নাই—রতিকান্তের সমক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ কি বিদ্রূপ করিবার হেতুই কেহ পায় নাই। সকলেই জানে, তার কথায় যে-ব্যাপারের মীমাংসা হয় না, শরণাপন্নের অনুরোধেও সে-ব্যাপারে কথা বলিতে যাওয়া রতিকান্ত লঘুত্ব মনে করে। হরেন্দ্র কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছে, কা'দের মাম্‌লায় হিতৈষী পরামর্শদাতা সাজিয়া দুই পক্ষেরই টাকা খাইয়াছে, নাম জাল করিয়া কাহার তামাদি খতে উস্থল দিয়াছে, ইত্যাদি, কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কোন ফল হয় নাই।

কে একজন একদিন দুঃখসংবরণ করিতে না পারিয়া হরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অম্‌নি একটা দোষের অভিযোগ করিয়াছিল; তাহাতে রতিকান্ত বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিল,—আমি কিছু বল্‌লে কি হরেন্দ্রের সংশোধন হবে মনে করো?

—সে-আশা কম; তার স্বভাবই ঐ, পেশাই ঐ।

—তবে? আমার মনে কষ্ট দেওয়া ছাড়া ও কথার অন্য ফল নাই। বলিয়া রতিকান্ত ভারি প্রাণস্পর্শীভাবে ব্যথিতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

এই রতিকান্ত আজ প্রত্যুষে মারা গেল। রোগযন্ত্রণা তাহাকে বেশীদিন সহ্য করিতে হয় নাই; সাতদিন ভুগিয়া সে মারা গেল শুক্র-বারের প্রত্যুষে—শনিবারের প্রারম্ভে।

বিষণ্ণ হইল সবাই—

কেবল হরেন্দ্রের মনে হইল, রতিকান্ত মরিয়া আজ তার বিচরণ-ক্ষেত্র অবাধ করিয়া দিয়া গেল। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা যে, হরেন্দ্রের অকারণে সর্ব্বদাই ভয় হইত, কবে যেন জোট পাকাইয়া রতিকান্ত তাহাকে

জব্দ করিতে দাঁড়াইয়া যায়। ষড়যন্ত্র করিয়া মানুষকে অভয় আর উৎসাহ দিয়া আর কাজের প্যাঁচ দেখাইয়া দিয়া রতিকান্ত তাহাকে বিপন্ন করিতে যে কোন সময় পারে। ঠিক্ এই সময়টিতে রতি হয়তো সেই কাজেই ব্যপৃত রহিয়াছে! এই ভয়ের দরুণ, আর রতিকে লোকে ভয় শ্রদ্ধা দুই-ই করে এই কারণে রতিকান্তের প্রতি হরেন্দ্রের ঈর্ষা আর বিদ্বেষের ভাব ছিল এত যে তা' বলিবার নয়—ভয়ও ছিল বেজায়; কাজেই রতিকান্ত মারা যাইতেই হরেন্দ্র হাল্‌কা হইয়া গেল; তার মনে হইল সম্মুখে প্রাধান্য আর বাধা রহিল না···

তার আরো মনে হইল, রতিকান্তের নামের সঙ্গে একটা বদনাম জড়াইয়া দিলে প্রতিবাদ করিবার গরজ এখন কাহারো হইবে না—রতিকান্তের এখন কোন শক্তি নাই। কিন্তু তবু হরেন্দ্রের মনে হয়, আর, ভারি গ্লানি জন্মে যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া রতিকান্ত যেন লোকসমক্ষে তাহাকে ভারি হেয় করিয়া রাখিয়াছিল; হরেন্দ্র যেন প্রত্যক্ষই করিত, লোকে উভয়কে তুলনার তুলাদণ্ডে তুলিয়া দিয়া তাহাকেই মনে মনে উপহাস করিতেছে। বদ্‌নাম রটানো যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করানো যাইবে না বোধ হয়। হরেন্দ্র মাথা নাড়িতে থাকে।

এ গেল একরকম—

অন্য রকম ব্যাপার এই যে, হরেন্দ্রের ছেলে অপূর্ব্ব মানুষ হয় নাই; সে টেড়ি কাটিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়—বাপকে গ্রাহ্যই করে না—বাপের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ অর্থাৎ মেজাজী তর্কে প্রবৃত্ত হয়; বাপকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপও না করে এমন নয়—তাহাকে ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি আখ্যা প্রায় স্পষ্ট বাক্যেই দেয়····

ছেলের এই ধৃষ্ট দুঃসাহসের কারণ হরেন্দ্র অনুমান করিতে পারিত না—ক্রুদ্ধ হইত, আর ভাবিত, ছেলেটাই বদ্।

কিন্তু একদিন মাখন দত্ত হরেন্দ্রের চোখ ফুটাইয়া দিল—

বলিল,—ছেলের বিরুদ্ধে যা' বল্‌লে তা' সত্যি; কিন্তু খুব বেশী গা'ল তাকে তুমি দিতে পারো না—গা'ল দে'ওয়ার হক্‌দার তুমি নও; দোষ সম্পূর্ণই তার নয়।

—আর কার তবে?

—বল্‌ছি। মানুষ ভালো জিনিসটাই পছন্দ করে, এ কথা তো' তুমি মানো?

—মানি।

—তুমি যে খুব ভালো জিনিস নও তা' কি তুমি স্বীকার করো?

হরেন্দ্র হাসিল; বলিল,—করি। অন্যায় কাজ না করি এমন নয়···

—ছেলে তা' জানে?

—জানা সম্ভব।

—কাজেই ছেলে তোমাকে পছন্দ করে না—অশ্রদ্ধেয় ক্ষুদ্র মনে করে।

—পাষণ্ড।—ছেলের উদ্দেশে হরেন্দ্র প্রচণ্ড ভ্রূভঙ্গী করিল।

—রেগো' না। রতিকান্তের ছেলেরা বাবাকে কতো ভক্তি করে দেখেছ ত'। বাপকে তারা তুচ্ছ মনে করে না—বাপের কথা ভাবতে তারা গৌরব বোধ করে।

মাখনের ঐ বিশ্লেষণ শুনিয়া হরেন্দ্রের আর বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই; এবং রতির তুলনায় নিজেকে নগণ্য মনে হইয়া পরাভবের জ্বালায় অস্থির হইয়া হরেন্দ্র মর্ম্মান্তিকভাবে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল রতিকান্তের উপর—যে আছে বলিয়া সে ছোট হইয়া গেছে।

এই রতিকান্ত আজ মারা গেল।

অনেকে শেষ দেখা দেখিতে আসিল, কিন্তু হরেন্দ্র আসিল না;

কিন্তু সেখানে যে একটা কথা হইল তা' হরেন্দ্রের কানে আসিল অবিলম্বেই।

মৃতদেহের সমীপে দাঁড়াইয়া মৃতের সম্বন্ধে আক্ষেপের সঙ্গে সুখ্যাতির কথা বলা, অর্থাৎ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়া থাকে, ইহা দস্তর এবং ভদ্রতা; কিন্তু রতিকান্তের চরিত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে দলের ভিতর কে একজন বলিয়া বসিল,—বিধাতার ব্যবস্থা ভালো; মারা গেল রতিকান্ত, বেঁচে রইলো হরেন!

উপস্থিত অনেকেরই ওষ্ঠপ্রান্ত বক্র কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কেহই এই আফ্‌শোসের প্রতিবাদ করিল না; বলিল না যে, কেন, হরেনও ত' লোক মন্দ নয়!

হরেন নিজে সেখানে উপস্থিত থাকিলে কি করিত কে জানে; কিন্তু তার ছেলে অপূর্ব্বর মাথা হেঁট হইয়া গেল....আস্তে আস্তে সে চলিয়া আসিল; এবং বাড়ীতে আসিয়া সে চোখ রাঙ্গাইয়া মনের ঝাল ঝাড়িল মায়ের কাছে; তার মা তাহা শুনাইয়া দিলেন হরেন্দ্রকে খুব শীঘ্রই....

হরেন্দ্র নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিল স্ত্রীর দিকে, আর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল মৃত রতিকান্তের উপর—মরিয়াও সে অপদস্থ করিতেছে!

রতিকান্তের শ্রাদ্ধে সমারোহ তেমন কিছু হইল না—ভূমি, আসন, জল প্রভৃতি সাধারণ ষোড়শদানে ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। রতিকান্ত মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিল, শ্রাদ্ধে অতিরিক্ত খরচ করিও না। সে-টাকা তোমাদের হাতে থাকিলে আমি তৃপ্তি পাইব বেশী।

শ্রাদ্ধের পর রতিকান্তের স্ত্রী বলিলেন,—গঙ্গা স্নান করব' আমি, আর, সাতদিন গঙ্গাতীরে বাস করব'।

বাড়ীর একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া ছেলেরা মাকে লইয়া নৈহাটি গেল।

তখনই দেখা দিল একটি সুযোগ।

হরেন্দ্র ইহা কদাচ বিশ্বাস করে নাই যে, রতিকান্তের মনে মনেও কোনোই পাপ কোন কালেই ছিল না।—দুনিয়ায় নিষ্পাপ মানুষ নাই; পরস্বে লোভ না থাকিয়াই পারে না; পরশ্রীকাতরতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; অন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই হইবে; মিথ্যা কথা নিশ্চয়ই বলিত; কিন্তু অত্যন্ত চতুর বলিয়া ধরা পড়ে নাই কোনোদিন; দেবতার প্রতি অবিশ্বাস ছিল বলিয়াই মনে হয়, কারণ, সত্যনারায়ণের পূজা করিতে তাহাকে কোনোদিনই দেখা যায় নাই····

কিন্তু ও-সব কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা ভয়ের কথা, রূঢ় উত্তর শুনিবার ভয় তাতে আছে, কারণ, রতিকান্ত কাহারো শত্রু ছিল না। তার দলের লোকও বোধ হয় রতির তথাকথিত অবাঞ্ছনীয় কাজগুলি এখন, তার মৃত্যুর পর, মার্জ্জনা করিয়াছে।

রতিকান্তের বাড়ীতে তালা দেওয়া আছে। একটি ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা রতিকান্তের স্ত্রী করিয়া গেছেন। একটি মৃৎপ্রদীপে প্রচুর পরিমাণে তেল দিয়া সন্ধ্যা লাগিতে লাগিতে নিযুক্ত লোকটি আলো জ্বালিয়া দিয়া যায়—প্রথম রাত্রিতেই তারা দু'ভাই আসিয়া সেই ঘরে শয়ন করে।

সেদিন রাত্রি তখন আটটা—শৃগাল-কুল একবার ডাকিয়া নিঃশব্দ হইয়া আছে। আকাশের কোথায় এক ফালি চাঁদ আছে—সে-চাঁদটুকু আলো যা' দিতেছে তা' সামান্য, কিন্তু তার আলো যেখানে বাধা পাইয়াছে সেখানে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে প্রচুর।

এই সময়ে মাখন দত্তের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা বসে—আজও

বসিয়াছে ; বিনোদ বোস, সারদা ঘোষ, বনমালী চাকি প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত—

আর, এই বৈঠকখানার হাত পঞ্চাশেক দূরে পথের উপর দেখা গেল হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে। যখন প্রথম তাহাকে দেখা গেল তখন সে হাঁটিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই সে দৌড়াইতে শুরু করিল—তার গন্তব্য স্থান মাখন দত্তের বৈঠকখানা ; হুরমুড় করিয়া ঢুকিয়া সে দড়াম্ করিয়া আছ্ড়াইয়া পড়িল তক্তাপোশের উপর ; তক্তাপোশ কাঁপিয়া উঠিল ; হরেন্দ্রের প্রায় ছ'মণ ওজনের দেহটা শব্দ করিল খুব।

সবাই চম্‌কিয়া উঠিল—

সারদা ঘোষ বলিল,—কে এসে পড়ল' অমন করে ?

মাখন দত্ত চিনিতে পারিয়াছিল ; বলিল,—হরেন চক্রবর্ত্তী।

—কি হ'ল, কি হ'ল তোমার, হরেন ?—উৎকণ্ঠিত হইয়া সবাই সমস্বরে জানিতে চাহিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরেন বলিল,—আর কি হ'ল ? ভয়ে ম'লাম ; গেছি আমি।

—ভয় ? কিসের ?

অনেকেই প্রশ্ন করিল।

হরেন উঠিয়া বসিল ; বলিল,—বেরুলাম বাড়ী থেকে ; ইচ্ছেটা রামকুমারের সঙ্গে একবার দেখা করা। তার মাম্‌লার দিন কাল। তার সাক্ষী আবার আমি। আস্‌ছি আন্‌মনে—পথে জনমানব নাই। রতিকান্তের বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, বা'র দরজার কাছে প্রাচীরের অন্ধকারে রতিকান্ত দাঁড়িয়ে !—একেবারে স্পষ্ট দেখ্‌লাম, হুবহু সে-ই। খালি গা ; প্রকাণ্ড দেহ যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে ! সে কি তখন দশা আমার ! কি রকম যে হ'ল আমার তা' বল্‌তে

পারিনে ; ভয়ে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে' যেন কাঠ হ'য়ে গেলাম। ও'রে বাবারে বলিয়া হরেন্দ্র সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কেহ কোনো মন্তব্য করিল না, ঘটনা সম্ভব কি অসম্ভব—সবাই যেন গম্ভীর হইয়া গেল....

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল,—তোমাদের ভিতর এসে এতক্ষণে সুস্থ হ'লাম।....শনিবারে মৃত্যু ; গতি হয়নি'। পুণ্যবান্‌ সৎলোক শনিবারে মরে না, আর, মরে' ভূত হয় না। রতিকান্তের স্ত্রী বোধ হয় টের পেয়েছিল কিছু—তা'-ই গঙ্গাতীরে স্বামীর আত্মার উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা করতে গেছে।—বলিতে বলিতে হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—যাই। ও-পথে সন্ধ্যার পর আর যাচ্ছিনে।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রেরই তৎপরতার ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামের প্রায় সবাই এই মিথ্যাটা শুনিল যে, রতিকান্তের গতি হয় নাই—সে বীভৎস ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে।

লোকনাথের তামসিকতা

লোকনাথবাবুর স্ত্রী ভবানীর চিরকালের মনের কষ্ট এই যে, তিনি সুন্দরী নন্। সুন্দরী না হওয়ায় যে অসুবিধা আছে আর ক্ষোভের কারণ ঘটে সময় সময়, তা তিনি যথার্থভাবেই আর তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছেন। তবে ভবানীর শ্রী সম্বন্ধে লোকে বলে, তাঁর রূপে সৌভাগ্যবতী নারীর এমন অপরূপ লক্ষণসমূহ বিকশিত হইয়া আছে যাহা অন্যত্র দুর্লভ—তাঁর সমসাময়িক অন্য নারীর দেহে তা নাই বলিলেই চলে। রূপের অভাব সেই মনোরম শুভ লক্ষণের জ্যোতির অন্তরালে পড়িয়া কেবল অদৃশ্য হইয়া নাই, রূপের আলোচনায় তার সেই অভাবের উল্লেখই হাস্যকর এবং প্রতিবাদের যোগ্য। কিন্তু নিজের ব্যতিক্রম আর ব্যতিরেক সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রখরভাবে সজাগ বলিয়া লোকের এই সরস কথায় আর সূক্ষ্ম মর্ম্মজ্ঞতায় ভবানী আদৌ সন্তুষ্ট নন।

রূপতৃষ্ণা মানুষের জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে, ভবানীর মনেও রূপের তৃষ্ণা ছিল এবং আছেই—তাঁর এই অনুভূতিতে কিছুমাত্র দ্বিধা কি অস্বচ্ছতা নাই; এবং ইহাও তিনি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেন যে, তাঁর স্বামী তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া তাঁর সেই চিরজীবী রূপতৃষ্ণা মিটাইয়াছেন—অতৃপ্তি কি অরুচি একটুও নাই। লোকনাথের মত বর্ণাঢ্য স্বাস্থ্যবান্ আর প্রমোদ-কৌতুকী সুপুরুষ অল্পই চোখে পড়ে, ইহা অত্যুক্তি নহে—তাঁর এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সেও রং টকটক করে—প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতা কি স্তিমিত ভাবটি শরীরের কোথাও দেখা দেয় নাই—সকল ইন্দ্রিয় সমান কার্য্যক্ষম এখনও আছে। নিজের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা

সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়াই ভবানী পরম বিস্মিত হইয়া আছেন যে, স্বামী তাঁহাকে পাইয়া খুশী হইয়াছেন কেমন করিয়া !

ভবানীর রং কালো, চোখ ছোট, ভুরু পাতলা, ইত্যাদি, অর্থাৎ ভোগার্থে অপরিত্যজ্যভাবে আকর্ষণ করিবার মত রূপৈশ্বর্য্য তাঁর সত্যই নাই। কিন্তু লোকনাথের আচরণে একদিনের তরেও একটু অভাববোধ কি অতৃপ্তি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই ; বরং তার বিপরীত—তিনি বিশেষ আনন্দেই আছেন ; কারণ, স্ত্রীভাগ্যেই ধন ; বিস্তর ধনসঞ্চয় করিয়া লোকনাথ পরম প্রীতিবশত স্ত্রীকে আরাধ্যাদেবী লক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছেন।....

বলেন, তোমার ভাগ্যেই আমার এত প্রসার !

লোকনাথ উকিল—দেওয়ানি আর ফৌজদারিতে তিনি সমান দক্ষ—ঐ দুই ক্ষেত্র হইতেই তাঁর সমান চাহিদা এবং আয়।

ভবানী হাসিয়া বলেন, হ্যাঁ।. মক্কেল নিয়ে বাইরে বসে' থাকার ইচ্ছে থেকে গেছে ঢের।

আগেকার ইঙ্গিতে সূত্রে কথার নিহিতার্থ পরিষ্কার হইয়া যায় ; স্ত্রী সুন্দরী নহে বলিয়াই অন্তঃপুর, অর্থাৎ শয়নকক্ষ, ত্যাগ করিয়া তিনি অক্লেশেই বহির্ব্বাটীতে মক্কেল আর মাম্‌লা লইয়া রাত বারটা করিতে পারিয়াছেন এবং পারেন।

কিন্তু লোকনাথ পুনঃপুনঃ তাহা অস্বীকার করিয়াছেন—:কবল অস্বীকারই করেন নাই, অমন কথা উচ্চারণ করিতে সদুঃখে নিষেধই করিয়াছেন।

সুতরাং ধনে জনে প্রেমে প্রীতিতে ওঁরা ভালই আছেন।

অধুনা কথা হইতেছে ইহাই যে, বড় ছেলে মহীতোষের বিবাহ দিতে হইবে—কয়েক স্থান হইতে মেয়ে দেখিবার জন্য সানুনয় আহ্বান

আসিয়াছে। মহীতোষ সম্প্রতি এম-এ, পাস করিয়া অধ্যাপক হইয়াছে—সুতরাং কতিপয় সুন্দরী এবং তথাকথিত সুন্দরী আর অসুন্দরী কন্যার ও পিতার লুব্ধদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহারই উপর। এই লুব্ধতার সুযোগে দর বাড়াইবার কথা যে লোকনাথ চিন্তা করিতেছেন না এমন নয়—

কিন্তু ছেলের মায়ের মন সেদিকে নাই। ভবানী চান্ এমন সুন্দরী বধূ যার তুলনা মেলা কঠিন; কারণ, তাঁর বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের বলে গর্ব্ব এই যে, রূপে গুণে মহীতোষের তুলনা নাই।

মহীতোষের চেহারা ঠিক্ তার বাপের মত; দ্বিতীয় ছেলে বিশ্বতোষ একটু ময়লা রঙের—তার গড়ন হাল্‌কা ধরণের; ছোটছেলে ভবতোষ কতকটা মায়ের মত। সুশ্রী ওরা তিনটি ভাই-ই।

লোকনাথ আগে যাইবেন দিনাজপুর কি জামসেদপুর, কি গোপালগঞ্জ কিংবা আরা, তাহাও তর্কের বিষয় হইয়া আছে; কারণ পণ্ডশ্রম করিতে সবাই যেমন তিনিও তেমন অনিচ্ছুক। বন্ধু বিভূতিবাবুর বিশেষ আগ্রহে এবং অনুরোধে বাধ্য হইয়া মাস দেড়েক পূর্ব্বে বিক্রমপুরের অনতিসুশ্রী কালো মেয়েটিকে দেখিবার পর হইতে মেয়ে দেখার আমন্ত্রণ রক্ষায় লোকনাথের পণ্ডশ্রমের ভয়ই জন্মিয়াছে। ঐ সমুদয় স্থান হইতেই মেয়ের ফটো আসিয়াছে। ভবানী তদ্দৃষ্টে বলিতেছেন, আগে জামসেদপুরের মেয়েটি দেখা উচিত; কারণ চেহারা দেখা যাইতেছে তারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—অবশ্য ফটোতে যদি জুয়াচুরি না থাকে। বয়স অল্প বলিয়াই মনে হয়, গড়নও সুন্দর। তদুপরি মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে।

লোকনাথ বলিতেছেন, আন্দাজে ঢিল মারা ত! মন-মেজাজ কেমন হবে, পয় কেমন, কিছুই আগে বুঝ্‌বার উপায় নেই। ভয় এই যে, একটি ভিতর-পচা মাকাল এনে ঘরে না তুলি!

ভবানী বলেন, পৃথিবীর যাবতীয় পুত্রের পিতা যেমন তেম্‌নি কন্যার

পিতাও চিরকাল এইরূপ আন্দাজেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছেন অনুমানের উপর নির্ভর আর নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি! দেখিতে হইবে জ্ঞানত আমাদের ত্রুটি না থাকিয়া যায়। পিতা-মাতার শিক্ষা, সামাজিক সম্মান, রুচি এবং প্রতিষ্ঠার পরিমাপে পরিবারের লোকের মনের গতি এবং বৈশিষ্ট্য ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লোকনাথ বলেন, তোমার উক্তি যথার্থ, এবং সদর্থপূর্ণ। জামসেদ-পুরেই আগে যাই।

পরের জন্য স্ত্রী-নির্ব্বাচন যাঁরা সহজ স্বাভাবিক এবং নিঃসন্দেহের কাজ মনে করেন তাঁরা ভুল করেন। নিজের স্ত্রীর জন্য আটপৌরে কাপড় এবং ছেলের পায়ের মাপের সাধারণ জুতা কিনিতে গিয়াই ভুলিতে হয় অনেক—তখন আত্মবিশ্বাসের অভাববশত নিজের পছন্দ আর অনুমানকে সন্দেহ করিতে হয় ঢের, ইহা কে না জানে? কিন্তু অননুমেয় আর অনুচিত আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহাই যে, ঠিক্ এই ব্যক্তিই পুত্রের জন্য বধূ নির্ব্বাচনের ভার লইয়া দম্ভভরে কর্তৃত্ব করিতে বসিয়া যান্, আর নির্ভয়ে মনে করেন, পুত্রের মতিগতি আর সৌন্দর্য্যবোধ পিতার অনুরূপ হইতে স্বভাবতই বাধ্য। ইহার চাইতে অসূক্ষ্মদর্শন আর অসৌষ্ঠব কিছুই হইতে পারে না।

বিবাহের উপযুক্তভাবে বয়ঃপ্রাপ্তা পরের কন্যাটিকে সম্মুখে আনিয়া বিবাহার্থী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কি চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হন্ তাহাও বিস্তর চিন্তার বিষয়। ছেলের বাবা ছেলেকে এ বিষয়ে কতটুকু জানেন? জিজ্ঞাসা করিলে ছেলের বাপ হয় তো উত্তরটি এড়াইয়া যাইবেন, অথবা এমন উত্তর দিবেন যাহার ভাষা এবং অর্থ প্রাঞ্জল নয়।

লোকনাথ উহা—পুত্রের জন্য স্ত্রী নির্ব্বাচনে যে সংকট আছে তাহা—উপলব্ধি করেন কি-না বলা যায় না, কিন্তু তিনি শুভদিনে সোৎসাহে যাত্রা করিলেন···এবং নির্ব্বিঘ্নে জামসেদপুর এবং কন্যার পিতার আলয়ে পৌঁছিয়া এক সময় একটা চঞ্চল সমারোহের মাঝে কন্যাকে দেখিতে বসিলেন।

কনে' দেখার ব্যাপারটা প্রায়ই সহজ স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার ভিতর ঘটে না—সবাই যেন স্ফূর্তির দম খানিক্ চাপিয়া রাখে; স্বয়ং কন্যা থাকে অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া এবং দায়গ্রস্ত কন্যাপক্ষীয় লোকগুলি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতির উদ্বেগে যেন মনে করিতে থাকে, সময়টুকু ভালয় ভালয় কাটিলে বাঁচি।

কিন্তু এখানে তেমন ঘটিল না—কন্যা স্বয়ং কিছুমাত্র আড়ষ্ট নয়—খাসা সপ্রতিভভাবে বসিয়া আছে এবং এঁরা, কন্যার স্বজনবর্গ, কতকটা নিরপেক্ষভাবে যেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিত।

লোকনাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে মেয়েটি বেশ সহজভাবে তার নাম বলিল; বলিল, আমার নাম মায়া।

ভবানী রাঁধেন ভালো—তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, রাঁধিতে জানে কি-না জিজ্ঞাসা করিও।

লোকনাথ তা জানিতে চাহিলেন—

কিন্তু কোন্ সূত্রে কিসের উদ্ভব হয় তা কিছুই অনুমান করিবার উপায় নাই। মায়া বলিল—জানি কিছু কিছু। তবে যা ফরমাস্ হবে তাই-ই আমি রাঁধতে পারব তা আমি স্বীকার করছিনে কিন্তু!

স্বীকারোক্তি লোকনাথ চান্ না—অতটা ব্যাপক অর্থে তিনি রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, ইহা নিশ্চয়। তাঁর ক্ষুদ্র প্রশ্ন ছিল, "রাঁধ্তে জান? কিন্তু মায়া জবাব দিল সমগ্র হেঁশেল জুড়িয়া—তার জবাব শুনিয়া

লোকনাথের আগে জন্মিল একটু কৌতুকভাব—মনে হইল উক্তির ফলাফল বিবেচনা করিয়া মেয়েটি বেশ পাকা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। এখন জানি বলিয়া স্বীকার করিলে নিজেরই কথার ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হইবে—মেয়েটি তা ভাবিয়া লইয়াছে এক মুহূর্তেই। উকিলকে জব্দ করিয়াছে!

—তা কি সম্ভব? বলিয়া লোকনাথ মায়ার বাবা মহেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁর মনে কূট অভিসন্ধি না থাকায় মেয়েটির এই আত্মরক্ষার অকারণ প্রগল্‌ভ উদ্যম দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু চটিয়াও গেলেন।

তারপর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

বলিলেন ম্যাট্রিক পাস করেছ তুমি। লেখাপড়ার কথা জান্‌তে চাওয়াই অন্যায়। কিন্তু বলো দেখি, টাকায় বত্রিশখানা কাপড় হ'লে চল্লিশখানা কাপড়ের জন্যে ধোপার পাওনা হয় কত? ভেবেই বলো বলিয়া তিনি প্রশ্নকর্ত্তা-হিসাবে এবং অন্যান্য সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী-হিসাবে ভুল উত্তরের কিংবা নির্ভুল উত্তরেরও প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন····

কিন্তু মায়া কোন উত্তরই দিতে পারিল না—ধোপার প্রাপ্যের হিসাব সে করিয়া উঠিতে পারিল না। স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে মনে যোগ-বিয়োগ কি গুণ-ভাগের প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে····

তার মানসাঙ্ক সমাধানের তুমুল চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে দেখিয়া লোকনাথ বলিলেন—সহজ হিসেব। টাকায় বত্রিশ অর্থাৎ দু'পয়সায় একখানা। বত্রিশ প্লাস্ আট, চল্লিশ। আটখানার দাম তা হ'লে চার আনা। চল্লিশখানার দরুন সে পাঁচসিকে পাবে।

ঠিকে পৌঁছিবার এই সহজ পদ্ধতি অবগত হইয়া মায়া নিশ্চিন্ত হইল কি-না কিংবা তার বাঞ্ছনীয় জ্ঞানলাভ হইল কি-না তা জানেন তার

অন্তর্য্যামী, কিন্তু লোকনাথ দেখিলেন, মায়ার অনবদ্য মুখে চোখে একটি অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ ভঙ্গীর উদয় হইয়াছে। হইবারই কথা, কারণ একটি অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে অপদস্থ হইয়াছে।

এবার প্রশ্ন করার পালা মায়ার—

বলিল—আপনার ছেলে শুনেছি অধ্যাপক। কিন্তু ঐ পুঁথিগত বিদ্যা উগ্‌রে' টাকা উপার্জ্জনের পথ যদি দৈবাৎ বন্ধ হ'য়ে যায় তবে তিনি কি উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করবেন?

—চেক্ কেটে। লোকনাথের মনে হইল তা-ই, কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—তা ত আমি জানিনে। এ প্রশ্ন তাকে করলেই কিছু জবাব পেতে হয় তো। তবে আমার মনে হয়, এখনই যদি সে চাক্‌রী না করে তবে তার চলে, পর-প্রত্যাশী না হয়েই এবং বিয়েতে পণ না পেলেও। বলিয়াই লোকনাথ হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন....

কিন্তু মায়া তাঁহাকে ছাড়িল না—

বলিল—আমাদের দেশে পুরুষ স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের ভার নেয়, কিন্তু মর্য্যাদারক্ষার ভার নেয় না। আপনার ছেলে সে-বিষয়ে শপথ করতে পারবেন?

—সে-কথা আর উঠ্‌ছে না। বলিয়া লোকনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া এই নিতান্ত অসময়েই গভীর আলস্যভরে একটা হাই তুলিলেন। তারপর হাসিমুখে মহেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তিনি যেন একটু উত্তেজিত হইয়াছেন।

মেয়ে দেখা শেষ হইল এবং বলা বাহুল্য, মায়ার সঙ্গে মহীতোষের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ আয়োজন নিষ্ফল হইয়া গেল। কিন্তু লোকনাথ বিচার করিলেন পুত্রকে বাদ দিয়া অর্থাৎ নিজেকে পুত্রের স্থানে বসাইয়া। তিনি কল্পনা করিতে পারিলেন না যে,

যে-রমণী অতিশয় স্বাধীনভাবে নয় সুস্থভাবেও নয়, বিভ্রান্ত অনুকরণের একটা দুঃসহ উত্তাপের সঙ্গে স্বামীর দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর চায় অশেষ রূপ সত্ত্বেও সে-রমণী তাঁহাকে সুখী করিতে পারে। স্ত্রীর এতখানি মননপ্রবণতা, এ ক্ষেত্রে যাহার নাম বক্তৃতা ও তর্কের ঝোঁক, পুরুষের জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়াই তাঁর মনে হইল। স্ত্রী হইবে অনুগামিনী অথবা বড় জোর সহগামিনী—অগ্রগামিনী কখনই নয়।

মায়ার রূপ অনুপম—

কিন্তু কথার প্রখরতায় রূপের প্রসন্নতা আচ্ছন্ন হইয়া মায়া একটি অপ্রীতিকর বস্তু মাত্রে দাঁড়াইয়া গেল—মায়ার মনটাকে তিনি যেন নিজের আধারে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না—ঝাঁজ লাগিল।

ভবানীর ইচ্ছা পুত্রবধূ সুন্দরী হইবে—

মায়া সুন্দরী; কিন্তু নিজের স্ত্রীর তুলনায় মায়াকে এত দুস্পর্শ, দূরবর্ত্তিনী আর স্বতন্ত্র মনে হইল যে, তাহাকে আপন করিবার লোভ লোকনাথের জন্মিলই না।

বিবরণ শুনিয়া ভবানী বলিলেন—না; ছেলে আমার আজ পর্য্যন্ত ঢের পরীক্ষে দিয়েছে; আর তাকে ঘরের ভিতর পরীক্ষেয় ফেলে কাজ নেই। পরীক্ষক বউ আমি চাইনে।

শুনিয়া লোকনাথ হাসিলেন; এবং তারপর গেলেন আরা—সেখানকার মেয়েটিকে দেখিয়া তাঁর মনে হইল, মেয়েটি খর্ব্বকায়া—মহীতোষের মত পুরুষের সঙ্গে সে ভারী বেমানান্ হইবে। স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী একটা অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া বিচরণ করিতেছে ইহা একটি অসুখকর পারিবারিক দুর্ঘটনা এবং সামাজিক কুদৃশ্য সন্দেহ নাই। তার

উপর লোকনাথের মনে হয়, খর্ব্বকায়া নারী সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর সুডৌল এবং পরিপুষ্টতম যৌবনে উপনীত হয়ই না—কীটদষ্ট ফলের মত ক্ষুদ্রতার ভিতরেই পাকিয়া ওঠে—তার দেহে পূর্ণবিকাশের আনন্দ আর ক্রীড়াময়তা নাই। শেষ কথা এই যে, ছোট আকারের মানুষের প্রতি লোকনাথের অহেতুক একটা অবজ্ঞাই আছে।

লোকনাথ ফিরিয়া আসিলেন—

ভবানী বলিলেন—উঁহুঁ। বেঁটে মানুষ ভারী কুৎসিত, আর তারা ফিচেল হয়।

তারপর লোকনাথ গেলেন গোপালগঞ্জ। বিস্তর পথকষ্ট তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল—রেলগাড়ী, ষ্টিমার, নৌকা প্রভৃতি যানে বেজায় ঝাঁকি আর দোলন খাইয়া তিনি গোপালগঞ্জে পঙ্কজবাবুর গৃহে পৌঁছিলেন....

যথারীতি আসর বসিল—

মেয়েটিকে সেখানে আনা হইল—

এবং লোকনাথ তাহাকে পছন্দ করিলেন না, কারণ তিনি দেখিলেন যে, মেয়েটির দেহ প্রকাণ্ড। সাধারণ আকারের পুরুষের পাশেও হয়তো তাহাকে প্রকাণ্ড দেখাইবে না, কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে সে প্রকাণ্ডই; মুখের চেহারা চমৎকার, কিন্তু মুখখানা গোলালো বলিয়া সমগ্র দেহের সঙ্গে ব্যাপ্তির পরিমাণে মানানসই হইয়াও বড় মনে হয়। ইহার উপর লোকনাথের মনে হইল, এই মেয়েটির বয়স হইয়াছে এবং তাহার ফলেই ইহার বধূমূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নারীর এ মূর্ত্তি যে সময়ে ফুটিলে মনোহর হইয়া চোখে পড়ে সে সময় এখন আগত বলিয়াই শিথিল কলেবর মেয়েটিকে গ্রহণ করিতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জন্মিল না। স্ত্রীর সলজ্জ অবনত বধূমূর্ত্তি বড় লোভনীয় বস্তু, এই তত্ত্বটি তিনি মনের খুব গোপন স্থানে অনুভব করিলেন বধূর শ্বশুর হিসাবে নয়,

নিরপেক্ষ পুরুষ হিসাবে নয়, যে-কোনো নারীর বল্লভরূপে তাঁর যা কামনা সেই হিসাবে। কিন্তু এ বড় বৃহৎ আর প্রসারিত, যেন আয়ত্তের বাহিরে, আর বাধ-বাধ ভাব এর নাই।

সুতরাং তিনি কোন জবাব না দিয়া চলিয়া আসিলেন এবং বিবরণ শুনিয়া ভবানী বলিলেন, ধেড়ে ধিঙ্গী বউ আমি চাইনে। আমার পাশে বস্‌লে মনে হবে সে-বুঝি আমার শাশুড়ী। তাই নয় কি ?

লোকনাথ হাসিয়া বলিলেন, হুঁ।

অগ্রহায়ণেই শুভ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে এবং পূজার ছুটির ভিতরেই মেয়ে দেখা শেষ করিতে হইবে—কাজেই মাত্র দিন তিনেক বিশ্রাম করিয়া লোকনাথ পুনরায় রওনা হইয়া গেলেন—

এবার গেলেন দিনাজপুরে—

এবং বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর মেয়েটি আনিয়া লোকনাথকে দেখাইলেন—লোকনাথ দেখিলেন—দেখিবা মাত্র কেবল যে পছন্দ করিলেন তা' নয়, তাঁকে চমৎকৃত হইতে হইল....কেবল তা-ও নয়—পুলকে প্রসারিত আর উন্মুখ হইয়া তাহাকে তিনি যেন একটা আনন্দহিল্লোলযুক্ত উৎসবের কেন্দ্রে বরণ করিয়া লইলেন....

সুন্দরী তন্বী—সুঠাম লঘু দেহ বর্ণগৌরবে আর পরিমাণ-সুষমায় আর শ্রী-লাবণ্যে এমন একটি মসৃণ পারিপাট্য আর সুনির্ম্মল সমগ্রতা লাভ করিয়াছে যে, লোকনাথের হঠাৎ মনে হইল, পুরুষের এ প্রাণপণ তপস্যার সামগ্রী—এ ছাড়া যথার্থভাবে আর কেউ তা নয়। পঞ্চদশ বৎসরের সঞ্চিত আর উদ্বেল রসপ্রবাহ যেন নিজের কৌমার্য্যের অক্ষত তপোলোকে সংযত রাখিয়া এ অঙ্গে অঙ্গে প্রভাময়ী আর প্রস্ফুটিতা হইয়া আছে—এ কেবল আছে তা-ই নয়—এ বিচ্ছুরিত বিকিরিত হইতেছে....

এত কথা লোকনাথের শুধু বিলাসপ্রিয় উগ্র কবিত্ব নহে—অনাত্মীয়া মেয়েটিকে তিনি সেই চক্ষেই দেখিলেন। তাঁর মনে হইল, এমন অলৌকিক মন্ত্রশক্তি কি দিব্য ইন্দ্রজাল যদি কোথাও থাকে যাহার প্রভাবে তিনি সেই অতীতকালের উত্তপ্ত আর দুর্দ্দম বর্দ্ধিষ্ণুতার মাঝে পৌছিতে পারেন তবে........

লোকনাথের কলেবর রোমাঞ্চিত হইল—

বলিলেন—বিশ্বম্ভর বাবু, এই মেয়েকেই আমি নেব। লেখাপড়া কিছু শিখেছে ?

—শিখেছে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃতও সামান্য লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে।

লোকনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—যথেষ্ট ....

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন বিভ্রমের মাঝে তাঁহার মনে হইল, কি অপূর্ব্ব নিবিড় চক্ষু দু'টি! নিমেষে নিমেষে ঐ কমনীয় আর আয়ত স্বচ্ছতার অভ্যন্তরে জগতের সচলতা প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করিয়া মুহুর্মুহু কি রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে—পৃথিবীকে এ কি চক্ষে দেখিতেছে—তাহা যেন ধ্যান করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা হয়।....তারপর তাঁহার আরও মনে হইল, ঐ চক্ষু দু'টিতে প্রেমের মর্ম্মবেদন পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার সম্মুখে যে হৃদয় ক্ষিপ্ত হইয়া না উঠিবে সে-হৃদয় অভিসম্পাতে পাষাণ হইয়া গেছে, কিংবা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে।

অবশ্য প্রথমত তিনি এ-সব কথা ভাবিলেন—তাঁহার বাহিরে যে ভাব-প্রবণ জগৎ আছে সেই জগতের তরফে, তাঁহার নিজের নিরপরাধ আর অপরিহার্য্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।

বলিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া শেখে কেমন তা ঠিক্ বুঝিনে। ম্যাট্রিক-পাশ মেয়েরাও বিশেষ কিছু শেখে ব'লে মনে হয় না।

বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, কেবল ফাঁকি দেয়। আমারই এক আত্মীয়

পরীক্ষার খাতা দেখেন। তিনি বলেন, যাচ্ছেতাই সব উত্তর লিখে আসে মেয়েরা, আর নকল করে।

শোভা বাদে উপস্থিত সকলেই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী মেয়েদের মূর্খতায় আর চতুরতায় হাস্য করিলেন।

কিন্তু মায়ার বেলায় যেমন—এই শোভার বেলায় তেমন করিয়া ধোপার হিসাব জানিতে চাওয়ার কথা লোকনাথের মনে হইল না....

বলিলেন—কোষ্ঠী-ঠিকুজি সব বাজে আমি মনে করি, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মত।

বিশ্বম্ভরবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার মানে?

—বিজ্ঞানটি এবং তার উদ্দেশ্য হয়তো ভালোই এবং নিখুঁত; কিন্তু যাঁরা ওর ব্যবসা করেন তাঁদের যথার্থ জ্ঞান আর প্রয়োগশক্তি অব্যর্থ নয়; এমন কি, এত কম যে, নির্ভর করা যায় না।

বলিয়াই লোকনাথ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, শোভা কৌতুক-উৎফুল্ল মুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দোষকীর্ত্তন শুনিতেছে...

লোকনাথের চোখ পড়িতেই আরক্তমুখে শোভা চোখ নামাইল এবং আরো যা ঘটিল তার পার্থিব তাৎপর্য্য বোধ হয় কিছু নাই। ঐ ঈষৎ বিচলনেই, আরক্তমুখে শোভা চক্ষু নত করিতেই, অপূর্ব্ব সুষমান্বিত একটা কিছু যেন ঘটিয়া গেল—যাহাতে অনিবার্য্যভাবে লোকনাথের মনে হইল, পরিপূর্ণ ঢলঢল মধুপাত্র হইতে এক ঝলক মধু যেন উপচিয়া পড়িল....

বিশ্বম্ভর তখন বলিতেছেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব বিজ্ঞ লোকের দ্বারা সাবধানে কোষ্ঠী মিলিয়ে বিয়ে দেবার পরই দুর্দ্দৈব ঘটেছে এমন ঘটনা দু-একটি আমি জানি।

এই কথায় পরিষ্কার হইয়া গেল যে, কোষ্ঠীগত বিঘ্ন ওঁরা কোষ্ঠী-বিচার

না করিয়াই উত্তীর্ণ হইয়া গেছেন এবং আরও বুঝা গেল, এ বিবাহ হইবে; অন্য আপত্তি লোকনাথ তুলিবেনই না। অগ্রহায়ণের একটা তারিখের উল্লেখও তিনি করিলেন—তাহাতেও বিশ্বম্ভর অকাতরে সম্মতি দিলেন। তারপর দেনা পাওনার কথাটা লোকনাথ বিশ্বম্ভরের উপরেই অকপটে নির্ভর করিয়া বিশেষ প্রীতিপ্রদভাবে নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন....

যখন তিনি রওনা হইলেন তখন দেখা গেল, উভয় পক্ষই পরস্পরের সৌজন্যে মুগ্ধ, নিশ্চিন্ত এবং নিঃসন্দেহ এবং প্রফুল্ল; আর সকলেরই যেন মনে হইতেছে, অগ্রহায়ণের ৬ই তারিখটা অত্যন্ত শুভ।

মধ্যম শ্রেণীর কামরায় যখন লোকনাথ উঠিলেন অর্থাৎ বিশ্বম্ভরবাবুর বড় পুত্র সুপ্রকাশ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে তুলিয়া দিল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন—ষ্টেশনের বাতি জ্বালানো হইতেছে। এই কামরায় যে দুটি যাত্রী ছিলেন তাঁহারা এখানেই নামিয়া গেলেন।

নির্জ্জনতার মাঝে আরোহণ করিয়া লোকনাথ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলেন...গাড়ী চলিতে সুরু করিল।

চলন্ত গাড়ীর চাকার গুরুগুরু ধ্বনি, তাহার দোলন আর ঝরঝর শব্দ একটা, তাঁহার নিঃসঙ্গ মনে একটা বিদ্রোহী অথচ মোহময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল কি-না কে জানে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই নির্জ্জন পৃথিবীতে তিনি একা—তাঁহাকে একা পাইয়া দূর যেন বেগবান হইয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছে—তিনি পূর্ণাবয়বে এবং সর্ব্বাঙ্গে যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।...বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল—শ্রীহীনা একটি নারী। অনুভূত হইল, স্বভাবদত্ত নিগূঢ় যে পিপাসায় তাঁর উদ্বেল যৌবন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার শান্তির রসপাত্র সে-নারীর হাতে

নাই। তাঁহার সে-আকাঙ্ক্ষা আদৌ দুরাকাঙ্ক্ষা নয়; কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা আর তৃষ্ণা তাঁহাকে প্রাণপণে গোপন করিতে হইল।

ভবানীর সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তাঁহার হাসিটিতে—স্বচ্ছ সরল উদার সুমিষ্ট হাসি—হাসিলে, হাসির অনন্ত ছটায় তাঁহার মুখশ্রীর সমস্ত দৈন্য জ্যোৎস্নালোকে কুরূপ মালিন্যের মত আবৃত অদৃশ্য হইয়া যায় —তখন ভারী সুন্দর দেখায় তাঁকে। তাঁর এই গ্লানিহীন, আন্তরিকতায় সদ্য ফুলের মত হাসিটি লোকনাথকে চিরদিনই ভারি মুগ্ধ করিয়াছে; কিন্তু কেবল সুন্দর হাসিতেই রূপপিপাসা চরিতার্থ হয় না, লোকনাথেরও হয় নাই। শব্দায়মান গতিশীল গাড়ীর অভ্যন্তরে নিরালায় যেন পৃথিবীর বাহিরে বসিয়া স্বপ্নাচ্ছন্ন আতুরতা আর মায়ালোকের মাঝে তাঁর যৌবনের অতৃপ্তি ভারি সতেজ হইয়া জাগিয়া উঠিল....

ভবানী বলেন, সুন্দরী বধূ আনিতেই হইবে।—

কারণ যা তিনি দেখান তা কেবল ব্যক্তিগত অভিলাষ নহে, সামাজিক প্রয়োজনও। তাঁহারা এখন বিত্তবান্ হইয়া একটা আভিজাত্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব কুটুম্ব হইবে যেমন সমকক্ষ পদস্থ ব্যক্তি, বধূও অর্থাৎ বংশধরের জননী হইবে তেমনি অভিজাত সম্প্রদায়ের উপযোগী, এমন কি অলঙ্কার, আর ঈর্ষা জাগানো সম্পদ। অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মুখে তাহাকে অসঙ্কোচে উপস্থাপিত করিতে না পারিলে তাহাকে খর্ব্ব হইয়া থাকিতে হয়—এ বড় অবজ্ঞেয় দুর্গতি, আর দুঃসহ ক্লেশের কথা—নিজের রূপহীনতার জন্য ভবানী সেই কারণেই আরও লজ্জিতা। তার উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দেয় ভবিষ্যতের চিন্তা—ভবানীর মনে হয়, বংশ সুশ্রী পুত্রকন্যায় সুশোভিত না হওয়া শিহরণজনক বিশ্রী একটা পাপ....

লোকনাথ এ সমুদয়ই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁর সেই

সামাজিক স্বীকৃতি আর স্ত্রীর সুসঙ্গত ইচ্ছা পূরণের বাঞ্ছা, সহসা একটা মানসিক বিপর্য্যয়ে দুস্তর বাধা পাইল…

মনে যে ভাবনার উদয় হয়, আর যার বলে ঘটে বিপ্লব, মানুষের শিক্ষা, রুচি, সংসর্গ, সংস্কার আর পারিপার্শ্বিক চিন্তা-প্রণালী সর্ব্বদাই তার কারণ কি-না জানি না, কিন্তু এমন একটা দুর্লঙ্ঘনীয় প্রভাবের আকস্মিক আবির্ভাব একেবারেই অসম্ভব নয়, যে নির্ব্বাপিত আশার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন একটা চৈতন্যকে তোলপাড় করিয়া ভাসাইয়া তুলিয়া দেয় একে-বারে শিখরে….

লোকনাথের হঠাৎ জন্মিল জ্বালাময় ঈর্ষা—

জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল ; দুর্ভাগ্য এমনি প্রবল যে, রূপ তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন একাকার হইয়া তাঁহার চক্ষুগোচর হইল না। কিন্তু পুত্র অসীম ভাগ্যবানের মত ঐ রূপ তার চোখের তারায় আর প্রাণের হিল্লোলে বহন করিয়া অহর্নিশি সম্মুখে বিচরণ করিবে, আর তাহাই তিনি চির-বুভুক্ষায় শুষ্ক অন্তর লইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিবেন কেবল! ইহা হইতে পারে না…

লোকনাথ চমকিয়া খাড়া হইয়া উঠিলেন—

দেখিলেন, অপূর্ব্ব শোভায় চন্দ্রোদয় হইতেছে।

সেইদিকে তাকাইয়া তাঁহার মাথা খানিক ঠাণ্ডা হইল, আর মনে হইল, পুত্রবধুর সেবা তিনি অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না—ইহাও হইতে পারে না।

স্বামীকে গম্ভীর দেখিয়া ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল?

লোকনাথ অধিকতর গম্ভীরভাবে বলিলেন—পছন্দ হ'ল না। আর

ঘুরতে পারিনে।

লোকনাথ গম্ভীর হইয়া ছিলেন—তার উপর তাঁকে ভারী উদ্যমহীন ক্লান্ত দেখাইতে লাগিল।

বলিলেন, বিক্রমপুরের সেই মেয়েটিকেই ঠিক ক'রে ফেলি—আর পারিনে।

ভবানী চম্‌কিয়া উঠিলেন; ভীতভাবে বলিলেন, সে যে কালো!

লোকনাথ হাসিয়া মুখ তুলিলেন; বলিলেন, সে ত তুমিও। তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

শ্যামাচরণের অঙ্গুষ্ঠ

জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাসভাজন এবং সজ্জন বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এবং সংযমী বলিয়া ঈর্ষ্যাভাজন অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মানুষ পরস্পরকে নিরন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিতেছে—মনে মনে এবং কার্য্যতঃ। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ কাজটির হেতুর যেমন ইয়ত্তা নাই, তেম্‌নি নাই তাহাতে ছোট-বড় বিচার।

কমলাকান্ত দুধ খাইয়া প্রসন্ন গোয়ালিনীকে উহাই দেখাইত; মার্জ্জার দুগ্ধ এবং মৎস্য চুরি করিয়া খাইয়া মানুষকে উহাই দেখায়; বৃষ গুঁতাইতে আসিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে দেখায় উহাই····

মানুষ অবিরাম উহাই দেখিতেছে এবং দেখাইতেছে। উহা দেখাইবার কারণ প্রধানতঃ এই : লোকে ও-পক্ষকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করিয়া জানাইতে চায়. তোমাকে গ্রাহ্য করি না; তোমাকে ফাঁকি দিলাম; তুমি আমার সঙ্গে মুখের কি গায়ের জোরে পারিলে না!

হাতের ঐ আঙুলটি সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে মানুষের রাগ করিবার কারণ উহা, অর্থাৎ অবজ্ঞা প্রভৃতি ছাড়া আরও আছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সকল আঙুলের চাইতে ঐ আঙুলটি দেখিতে খারাপ, খাটো এবং মোটা, এবং ঠিক সরল নয়। ঐ কদর্য্যতায় মানুষের রাগ আরও বাড়ে।

পুনরায় লক্ষ্য করিলে, ইহাও দেখা যাইবে যে, ঐ আঙুলটাকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া ধরা এবং হঠাৎ প্রাধান্য দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়া। কাজেই লোকে মনের ভাবপ্রকাশের আর

ভাবচালনার অনায়াসসাধ্য উপায় হিসাবে ঐ অঙ্গুলির উত্তোলন অর্থপূর্ণ এবং অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছে। বাঁ হাতের ঐ আঙুলটি ব্যঞ্জনার দিক্ দিয়া আরও তীব্র—এক জোড়া আরও বলবৎ, আরও গুরু। তবে মনে মনে উহা দেখানো পৃথক্ এবং গভীরতর ব্যাপার।

কিন্তু শ্যামাচরণ বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া বাঁ হাতের এবং ডা'ন হাতের, অর্থাৎ একজোড়া, বৃদ্ধাঙ্গুলি যুগপৎ কেন দেখাইয়া গেল তাহা ভাবিবার বিষয়।

পঞ্চাশের পরই বনে যাওয়ার, অর্থাৎ সংসারকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনের, একটা অনুজ্ঞা আছে; কিন্তু দেখা যায়, সে-অনুজ্ঞা এখন কেহ মানে না। তরঙ্গিনী নাম্নী যে-রমণী যৌবনে রূপের ছটায় উদ্যান আলোকিত করিয়া পুষ্পচয়ন করিত, সে বর্ত্তমানে গলিত কেশদন্ত আর লোল চর্ম্মে কুরূপা হইয়াছে বলিয়া এই সংসারই, অর্থাৎ জনপদসমূহ, অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে; অতএব গৃহে বাস অরণ্যে বাসের মতই, ইহা সত্য নহে—লোকে তা' মনে করে না—অতটা ভাবারোপণ আজকাল প্রচলিত নাই। সুমিষ্ট ফলে মূলে সমৃদ্ধ বাসের উপযুক্ত বন এখন নাই, এবং বনের কথা মনেই পড়ে না, ইহাও সত্য নহে। ঋণের দরুন উৎসন্নের উপক্রম হইলে, এবং অক্ষমতার দরুন স্ত্রীর ভৎ‍সনায় বিষের আগে বনের কথা অবশ্যই মনে পড়ে; কিন্তু অনভিজ্ঞ বা নাবালক পুত্রের হাতে সংসারের আর ভবিষ্যতের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বনগমন কখনই সম্ভব হয় না—

কেহ বলে, সুদিন আসিবেই; ছেলেরা মানুষ হউক, তখন সবাইকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইব....

কেহ বলে, ভগবান আছেন; তিনি সদয় হইলেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে—প্রজারা খাজানা মিটাইয়া দিবে—তখন দেখাইব অঙ্গুষ্ঠ সবাইকে।

ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গুষ্ঠ দেখিতে দেখিতে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার আয়োজন চলিতে থাকে....

কিন্তু কাহাকেও অপদস্থ না করিয়াও শ্যামাচরণ কি মনে করিয়া যুগল অঙ্গুষ্ঠ দেখাইল, তাহা জানি না ; তবে ঘটনা এই :

শ্যামাচরণের বয়স একদিন পঞ্চাশ পার হইয়া একান্ন হইল। এই বয়সই বনে যাওয়ার বয়স, এবং সেই কারণেই মানুষের বনে যাওয়ার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাচরণের সে-উদ্যম দেখা দেয় নাই—সে আকাঙ্ক্ষাই তার জন্মে নাই। ছেলেরা একদিন মানুষ, অর্থাৎ লায়েক হইবে, এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর প্রজারা খাজানা মিটাইয়া দিবে, সম্ভবতঃ এই আশা লইয়া সে গৃহেই আছে....তরঙ্গিনী বৃদ্ধা হইয়াছে কি না, তাহা সে জানেই না। কিন্তু গৃহে সে কুশলে নাই—তার অকুশলের প্রধানতম কারণ তার আর্থিক অবস্থা, তা' আদৌ ভাল নয়।

ওদের পারিবারিক পূর্ব্বাবস্থার কিয়দংশ এইরূপ :

দু' ভাইয়ের শ্যামাচরণ জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ রাধাচরণ বিদেশে থাকে ; সে রোজগার করে প্রচুর, এবং সে বলে, তার ব্যয়ও প্রচুর।

দু'ভাই একান্নেই ছিল, এবং আছে ; কিন্তু তাদের একান্নবর্ত্তিতার তেমন অনুভবযোগ্য মানে দাঁড়ায় নাই। ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা, হাঁড়ী-কড়াই, বাসন-বিছানা, বাঁশের ঝাড় আর আম-তেঁতুলের গাছ প্রভৃতি পৈতৃক সম্পত্তিসমূহ লোকজনের সাক্ষাতে এবং সালিশীতে এবং ঘোষণাপূর্ব্বক এবং একটা মেজাজের উপর ভাগাভাগি করিয়া লওয়াই তা'ই যার নাম ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হওয়া। কিন্তু এরা তেমন ভাবে পৃথক্ হয় নাই ; এবং সেই কারণেই প্রশংসার সহিত বলা হয়, দু'ভাই একান্নেই আছে।

দুই ভাই পৃথক্ হওয়ার পর একই স্থানে পাশাপাশি হইয়া বাস করিলে, পৃথক্ হওয়াটা তাৎপর্য্যযুক্ত বাস্তব হইয়া ওঠে; কিন্তু এক ভাই দ্বিতীয় ভাইকে যথাসর্ব্বস্বের মালিক করিয়া দিয়া যদি সরিয়া যায়, এবং যদি গরজ বা প্রেমের অভাবে আসিবার আগ্রহ না দেখায়, তবে তাহাই হয় অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার মত, এবং পৃথগন্নের পার্থক্য লক্ষিতই হয় না।

রাধাচরণ পৈতৃক ভবনে দাদার কাছে আগে আসিত—তারপর ঘটনাগতিকে ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিয়াছে....

ওদের যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তি বলিতে যা' লোকের নজরে পড়ে, তা' হইতেছে দু'খানা টিনের ঘর, বিঘাকতক জমি, ঘরকতক প্রজা....

আর, শ্যামাচরণের নিজের অর্জ্জিত সম্পদ্ হইতেছে চাকরিটি—তার ঐ চাকরির স্কুল-মাষ্টারীর, ন্যায্য আয় মাসিক ৪৫৲ টাকা। পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি রাধাচরণ নিশ্চয়ই লোভ করিত, অর্থাৎ অবলম্বন হিসাবে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিত, যদি তাহাকেও অনন্যোপায় হইয়া বাড়ীতেই থাকিতে হইত; কিন্তু সে থাকে বিদেশে—চা'ল ডা'ল কিনিয়া খায় সেখানকার; আর, বাকি খাজানা সম্পূর্ণ আদায় হইলেও, তার অর্দ্ধাংশে রাধাচরণের ধোপার খরচই হয় না।

রাধাচরণ চিরকালই প্রবাসমুখী, বিদেশপ্রিয়—

বলিত, বিদেশে বাহির না হইলে, মানুষের ষোলআনা চৈতন্যই ফোটে না—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার ও খেলাইবার অবসর হয় না; বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না—আর, প্রতিযোগিতাহীন নির্জ্জীব কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর মানুষকে অত্যন্ত গতরপোষা, দৃষ্টিহীন, অসার আর অক্ষম করিয়া রাখে। বিদেশে বিভুঁইয়ে লোকের আত্মনির্ভরতা আর সম্ভ্রমবোধ বাড়ে—প্রতিষ্ঠালাভের উদ্যম এবং বিদেশীর নিকট হইতে

শ্রদ্ধালাভের আকাঙ্ক্ষা আসে—মানুষ অনেকটা নিঃস্বার্থভাবেও কাজ করিতে প্রলুব্ধ হয়। বাংলার বাহিরে অনেক বাঙ্গালী যে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং স্মরণীয় হইয়াছেন তাহার কারণই ঐ....

ঐ সব কথা এবং আর অনেক কথা বলিয়া, আর, অনেক অমূল্য সুযোগের উল্লেখ করিয়া আর শ্রীবৃদ্ধির সুরম্য চিত্র বর্ণনা করিয়া রাধাচরণ তার দাদাকে বিদেশে যাইতে পরামর্শ দিত....

বলিত, আমাকে এখানকার স্কুলেই একটা মাষ্টারী নিতে বল্‌ছে, কিন্তু আমি নেবো না।

শ্যামাচরণ বলিত, সবই সত্যি; কিন্তু আমার উপায় নেই যে! পৈতৃক সম্পত্তি ফেলে দিতে পারি নে।

—কিন্তু চিরদিন যদি এম্‌নি না যায়। এখানে স্কুল-মাষ্টারীতে কি উন্নতি আশা কর?

শ্যামাচরণের হিসাব করাই থাকে—একদিকে ভূমির দান এবং আদায়ী খাজানার পরিমাণ, আর মাষ্টারীর বেতন, এবং অন্যদিকে খরচ কত....

বলিত, চলে' যাবে।

এ কথা অনেকদিন আগেকার; কিন্তু মনে আছে সবারই—অদৃষ্টের ক্রূরতায় এখন তা' অগ্রতম আর উগ্রতম হইয়া খুবই মনে পড়ে। তখন শ্যামাচরণ পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলে কি ঘটিত, সুবর্ণ সুযোগে সুবর্ণ সুলভ হইয়া উঠিত কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না; কিন্তু বিদেশে রাধাচরণের দিব্য উল্লাসের সহিত চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে....

তা' ছাড়া, শ্যামাচরণের এমন যে প্রিয় পৈতৃক সম্পত্তি, তাহাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ দেখা গেল, ক্লান্তি আসিতেছে, রক্ষণ

এবং বীক্ষণ অত্যন্ত অকারণ হইয়া উঠিতেছে—ভূমিতে ফসলোৎপত্তি এবং ভাগী চাষীর সাধুতা দিন দিনই এমন দ্রুতগতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে যে, ভাবিতে প্রাণে ঘা লাগে; খাজানা আদায় করিবার উদ্যোগেই দেখা যায়, নগদ পয়সার চাইতে সাম্নে বাক্যের ঝুরি আর চোখের জলই নামে বেশী। থোক টাকা হাতে আসে মাস-কাবারে স্কুল হইতে; কিন্তু অধুনা স্কুলের অবস্থা ভূমির মতই—আকাঙ্ক্ষিত দানের প্রতিটি কিস্তিই মুষ্টিমেয়; বেতনের সমগ্র টাকাটা হাতে পাইতে সময়ে সময়ে এত সবুর সহিয়া থাকিতে হয় যে, ধৈর্য্যে কুলায় না—হাত খালি হইয়া অবস্থা সঙ্গিন হইয়া ওঠে....

পূজায় রাধাচরণের একমাস ছুটি, তখনও, এখনও। আগে সে সেই ছুটির সময়ে বাড়ীতে আসিত। ঐ এক মাসের সাংসারিক খরচ অনেকটা সে-ই চালাইত—নূতন কাপড়-জামা-জুতাও বিতরণ করিত, সার্ব্বজনীন-ভাবে নয়, ভাইপো আর ভাইঝিদের ভিতর। সঙ্গতিসম্পন্ন খুড়া মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যাগণকে পূজায় নূতন কাপড় জামা আর জুতা দেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; খুব একটা প্রশংসার বিষয়ও নহে; কিন্তু উহারই মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল—শ্যামাচরণের স্ত্রী মহামায়া পর পর তিন বারই লক্ষ্য করিল যে, কাপড়-জামা-জুতা তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য যা' আনা হয়, তা নূতনই বটে, কিন্তু নিকৃষ্ট। এরূপ স্থলে ঐ ইতরবিশেষ কেবল লক্ষ্য করাই চলে—তার দরুন অতিশয় মন খারাপ করাও চলে, কিন্তু তার প্রতিবাদ করা চলে না; তুল্য মূল্যের হইলে মনে করা যায়, অকৃত্রিম স্নেহের দান—বেশী মূল্যের হইলে মনে করা যায়, অতুল স্নেহের দান, অল্প মূল্যের হইলে মনে হয়, কপট স্নেহের দান—কিছু উপহার দিয়া কেবল

চক্ষুলজ্জা কাটানো—সে দেওয়ায় স্নেহের চাইতে অনুগ্রহের ভাবটাই যেন বেশী। শ্যামাচরণ দরিদ্র, রাধাচরণ অর্থবান্; অবস্থার ঐ তারতম্যের দরুণই মহামায়ার মন একটু বেশী বাঁকিয়া গেল; তার মনে হইল, রাধাচরণ যেন পুনঃপুনই জানাইতে চায়, দরিদ্রের নিজের পছন্দ-মত কাঁড়া-আঁকাড়া বাছা অন্যায়—আকাঁড়া চা'ল দেখিয়া তার ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই—শূন্য ঝুলির ভিতর যাহা দেওয়া হয় তাহাই উহাদের শিরোধার্য্য, অর্থাৎ মহামায়া দেবর রাধাচরণের একটি অঙ্গুষ্ঠ লক্ষ্য করিল····

মহামায়া ব্যাপারটাকে ঐ ভাবে লইল; এবং রাধাচরণ প্রভৃতি চলিয়া গেলে, সে স্বামীকে জানাইল, অঙ্গুষ্ঠের কথা নয়, কাপড়-জামা-জুতার বিষয়টা····

শ্যামাচরণ তা' তিন বারের একবারও একটুও লক্ষ্য করে নাই—শুনিয়া সে বিস্মিত এবং বিষণ্ণ হইল; দরিদ্র বলিয়াই সে আঘাত অনুভব করিল বেশী····ক্ষুধার মত দরিদ্রের প্রেমাভিলাষও অধিকতর সতেজ—সম্বিৎ ও মর্য্যাদা-জ্ঞান অত্যন্ত সজাগ, অসহিষ্ণু আর তীক্ষ্ণ। কিন্তু নিজের ক্ষোভ সে প্রকাশ করিল না; স্ত্রীর মর্ম্মবেদনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সে হাসিয়া বলিল, তুমি হয়তো ভুল করেছ····

মহামায়া বলিল, এ ত' ভূত দেখা নয় যে, কি দেখতে কি দেখেছি বল্‌বে!

—সত্যিই যদি তা' হয়, তবে তার অন্য কারণও থাক্‌তে পারে—হয়তো টাকায় কুলায় নাই।

—তা' ত' হ'তেই পারে; একবার, দু'বার, তিন বারও তা' হ'তে পারে। বলিয়া মহামায়া একটু হাসিল।····অসম্ভব কিছুই নয়; আর, অনেক কাজের একমাত্র কারণটি চিরকাল লুকানোই থাকে; কিন্তু প্রেম-

প্রকাশে কুণ্ঠার সহজ প্রমাণ পাইয়া কেহ গভীর কারণ অনুসন্ধান, অর্থাৎ কল্পনা, করিতে বসে না।

মহামায়া খেদ করিতে আসিয়া হঠাৎ শিক্ষা পাইয়া গেল—শ্যামাচরণ বলিয়া দিল, এ-সব কথা আমাকে না জানানোই ভাল।

মহামায়া শিক্ষা পাইয়া স্বামীকে আর কিছুই জানাইল না; জানাইল না যে, জ্যেঠামহাশয়ের কালচিটে-পড়া জামা, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, চাদরের অভাবে অব্যবহার্য্য কাপড়পাতা বিছানা, এবং ঐ রকম আরও অনেক অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া রাধাচরণের ছেলেমেয়েরা বিস্তর গা-টেপাটিপি আর কৌতুক করিয়াছে তার সাক্ষাতেই—

অলকা, রাধাচরণের স্ত্রী, শ্বশুরের ভিটার টিনের ঘর তাদের বাসের অনুপযুক্ত মনে করিয়া খুঁত্‌খুত্‌ করিয়াছে বিস্তর—এবং অলকার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ কথা-কাটাকাটি হইয়া গেছে। তার উপলক্ষ উদ্দেশ্য তেমন কিছুই নয়—অলকা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তার ঝগড়া হইত....

মহামায়া বলিয়াছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে হ'ত না।

—তা' হ'লে আমিই লাগাতাম, এই তুমি বল্‌ছ....

—তা' বল্‌ছি নে, ছোট বউ। তাঁর কতকগুলো 'রকম' ছিল। তার প্রতিবাদ না করে স'য়ে গেলেই তিনি দিব্যি লোক।

—স'য়ে আমি যেতাম; কিন্তু দিব্যি হ'তে তাঁকে দেখিনি। দেখেছি, আমার ছেলেমেয়ের চাইতে তাঁর বড় ছেলের ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর টান ছিল বেশী।

অলকার অসন্তোষের ঐ কথাটা একেবারেই যে অকারণ তা নয়;

কিন্তু ইহাও সত্য যে, শাশুড়ীর টানের সেই কম বেশী গভীর কিছু নয়। বেশীটুকু যা' লক্ষিত হইয়াছে তা' বঞ্চিত দরিদ্রের প্রতি করুণা—সর্ব্বদা যারা কাছে থাকে আর যারা হাতে মানুষ, তাদের প্রতি অধিকতর মমতা। আর একটা কথা এই যে, ছোট বউয়ের দর্প এবং তার ছেলেমেয়েদের চালবাজির ধরণ দেখিয়া, আর তাদের অতিরিক্ত দাপটে বুড়ো মানুষ কখনও কখনও বিরক্ত না হইয়া পারিতেন না—টান অর্থাৎ আদর দেখানো তাঁর পক্ষে সাময়িকভাবে অসম্ভব হইয়া উঠিত।

ঐ কথার পর মহামায়াকে নীরব দেখিয়া অলকা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিয়াছিল, দিদি, কথা বল্‌ছ না যে?

—কথা বাড়া'লেই বাড়ে। মরা মানুষের নিন্দে না করাই উচিত; আর, খুঁত্ না আছে, এমন লোক নেই। কোন সময়ে কোন ব্যাপারে তোমার হয়তো মনে হয়েছে—মায়ের আমার ছেলেমেয়ের ওপরেই টান বেশী। আবার আমিও সময়ে সময়ে দেখেছি, যেন তোমাদের ওপরেই তাঁর টান বেশী—তা' না দেখেছি এমন নয়। তখন তা'ই মনে হ'ত; কিন্তু এখন বুঝছি, আমাদেরই বুঝার ভুল। ছেলেমেয়ের মায়ের অমন ভুল ঘটে।

ইহাও সত্য—শ্যামাচরণের ছেলেমেয়ের প্রতি অবিচার করিয়া রাধাচরণের প্রবাসাগত ছেলেমেয়েকে তিনি প্রশ্রয় ঢের দিয়াছেন। অলকা তা' না বুঝিত এমন নয়—তখন সে হাসিত; কিন্তু সেই কথার উল্লেখে এখন সে রাগ করিল—

বলিল,—তা' জানি নে। কিন্তু কথা বল্‌ছ না বলায় তুমি অনেক কথাই শুনিয়ে দিলে। বলিয়া অলকা যেন পরাস্ত হইয়াই উঠিয়া গিয়াছিল।

পরাস্ত হওয়ার অনেক জ্বালা—নানান্ ফল; আনন্দ অন্তর্হিত ত' হয়ই,

তার উপর ব্যক্তিবিশেষের ক্রমশঃ কূটবুদ্ধি খুলিতে থাকে। কিন্তু কূটবুদ্ধি খুলিলেই তা'কে খেলানো, অর্থাৎ তার অবাধ প্রয়োগ, সর্ব্বদাই সম্ভব হয় না ; নিরুপায়ের অস্বস্তি আরও ভয়ঙ্কর। তবে এ-ক্ষেত্রে দৈব তেমন বিরোধী নয়, রাধাচরণের স্ত্রী অলকা নিরুপায় নয়—কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিবার সুযোগ সুবিধা তার যথেষ্টই আছে।

শাশুড়ী কেমন ছিলেন, সেই চর্চ্চার পর অলকার মনে হইতে লাগিল, কেবল তাহারই সঙ্গে শাশুড়ীর কথান্তর হইত বলায় এবং শাশুড়ীকে দোষমুক্ত করায়, তাহাকেই মুখরা, অবুঝ, নির্ব্বোধ, বদ্‌মেজাজী, অসহিষ্ণু, দোষগ্রাহী ইত্যাদি অনেক কিছুই স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে।....সম্পর্কে এবং বয়সে ছোট হইলে কি হয়! টাকা কার?

বলা বাহুল্য, রাধাচরণের টাকা-কড়ির 'বিলি-ব্যবস্থা' স্ত্রী অলকার হাতে।

অনেক লেখালিখির পর মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছিল, এবং রাধাচরণের নিকট হইতে শ্যামাচরণের কাছে তা' আসিত —সেই অগ্রহায়ণে তা' আসিল না। মহামায়া টাকার এই ডুব মারার হেতুটি বুঝিল, শ্যামাচরণ বুঝিল না...সে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, "রাধা কেন টাকা পাঠালে না!" বলিয়া সে অনেক উস্‌খুস্‌ করিয়া এবং কয়েক দিন উদ্বিগ্নভাবে পথ চাহিয়া থাকিয়া জরুরী এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিল—

তখন টাকা আসিল ; টাকার সঙ্গে চিঠিও আসিল—

রাধাচরণ তার দাদাকে নয়, অলকা লিখিল মহামায়ার কাছে : "টাকা পাঠাইবার কথা মনেই ছিল না। অভিমান ত্যাগ করিয়া পত্র না দিলে টাকা পাঠানোই হইত না। কিন্তু আর কতদিন এইভাবে খরচ পাঠানো সম্ভব হইবে তাহা বলা যায় না। পাটের দর বাড়িবে শুনিতেছি। পাটের

দর দেখিয়া আগামী মাসে টাকা পাঠানো সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে” ইত্যাদি।

অলকা পাটের বাজারের খবর রাখে দেখিয়া, বধূমাতার আধুনিকতম প্রশস্ততায়, শ্যামাচরণ পুলকিত হইতে পারিল না, এবং অনুমানও করিতে পারিল না যে, ওদিকে সুবৃহৎ একটি অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলিত হইয়াছে...

কথা এই যে, পাটের দর এ বৎসর সত্যই বেশী হইয়াছে—দর ক্রমশঃ বাড়িয়া অধুনা ১০৲ টাকা দরে খরিদবিক্রয় হইতেছে; এবং ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বার মণ পাট বেচিয়া শ্যামাচরণ ১২০৲ টাকা ঘরে তুলিয়াছে। কিন্তু উহাই ত' ব্যাপারের সব নয়—খাওয়ার উদ্দেশ্যে সে টাকায় হাত দেওয়া চলে না। কন্যার বিবাহ আর দু'এক বৎসরের মধ্যে না দিলেই নয়—তার বয়স ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, পনর চলিতেছে...

সন্তর্পণে পুটলি বাঁধিয়া সমুদয় টাকাটা স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা হইয়াছিল ভরসাময় সেই উদ্দেশ্যেই; কিন্তু তার সমগ্রতা রক্ষা করা গেল না—তার উপর প্রচণ্ড এক ছোঁ মারিল জমিদারের নায়েব—ভাঙিয়া দিল। অত্যন্ত কড়া মেজাজ এবং কয়েক নম্বর নালিশ করার ভয় দেখাইয়া নায়েব সেই টাকার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই আদায় করিয়া লইল। নায়েবেরই বা দোষ কি! জমিদারের খাজানা চার বৎসর বাকি পড়িয়া আছে—বহু টাকা তাঁর প্রাপ্য। সুতরাং শ্যামাচরণ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া টাকা লইয়া জমিদারের কাছারীতে গেল, এবং নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাছারী হইতে ফিরিল। প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া জমিদারকে খাজানা দেওয়া শ্যামাচরণের মত মৃদু জোত্‌দারের কর্ম্ম নয়।

শ্যামাচরণ ঐ খবরটি অন্যতর উত্তরাধিকারী রাধাচরণকে দিল; কিন্তু

সেই করুণ কাহিনী ফলপ্রদ হইল না—পৌষের টাকা আসিল না। পুনরায় তাগিদ্ দিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল না।····

বহু বিলম্ব করিয়া এবার স্বয়ং রাধাচরণই লিখিল :

"দাদা, ক্ষমা করিবেন। এ বৎসর বরুণা ও করুণা উভয়েই ম্যাট্রিকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অনেক টাকা লাগিবে। অজয় মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। তাহার দরুণ খরচের অন্ত নাই। বরুণা ও করুণার শুভ বিবাহের কথাও দু'এক স্থানে উথাপিত হইয়াছে —বিস্তর টাকা লাগিবে।

বাড়ী হইতে আসিবার পর হইতেই আমার স্ত্রীর শরীর তত ভাল নাই, প্রায়ই বৈকালের দিকে চোখ জ্বালা করে শুনিতে পাই। তাঁহাকে সত্বরই পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে পাঠাইব মনস্থ করিয়াছি। শ্রীমান, শ্রীমতীরাও তাঁর সঙ্গে যাইবে। সেখানে বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতিতে টাকা জলের মত ঢালিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এবং অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া জানাইতে হইতেছে যে, টাকা অন্য বাবতে খরচ করিবার উপায় নাই।

আপনার উজ্জ্বলাও বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহের বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করিতেছেন তাহা জানাইলে সুখী হইব। আপনার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কাহাকেও যোগ্য পাত্র মনে করিয়া যদি সম্মত করিতে পারেন, তবে অল্প ব্যয়ে শুভ কার্য্য সমাধা হইতে পারে।"

তারপর "বাটীস্থ সকলের" স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খানিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে, "শ্রীচরণে প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন ইতি"—এবং তারপর নাম সহি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—এবং নামের পূর্ব্বে লিখিয়াছে, "প্রণত সেবক।"

অনুজের প্রণাম-গ্রহণের পরই শ্যামাচরণের কাছে জলের মত

পরিষ্কার হইয়া গেল যে, রাধাচরণ সাহায্যদান বন্ধ করিল, এবং উজ্জ্বলার বিবাহের খরচ সে কিছু দিতে পারিবে না।

শ্যামাচরণ ঐ চিঠিখানা তর্জ্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের ভিতর ধারণ করিয়া নিজের মুখে অকারণেই খানিক বাতাস দিল—তারপর আর বিশেষ কিছু সে করিল না—স্ত্রীকে পত্রখানা পড়িতে দিল....

তার পড়া শেষ হইলে অম্লান বদনে বলিল, উজ্জ্বলার বিয়ের ভাবনা আমি মোটেই ভাবি নে। টাকা আছে।

শ্যামাচরণ যেন রাধাচরণের অঙ্গুষ্ঠ লক্ষই করে নাই।

মহামায়া জানিতে চাহিল, কোথায় আছে?

—লাইফ-ইন্‌সিওরের টাকা পেতে আর বছর আড়াই বাকি...

—কিন্তু শ'আড়াই যে নিয়ে রেখেছ অনেক আগেই!

—তা' বাদেই সাত আট শো পাব। সুদ কেটে' রেখে' টাকাটা দেবে। তা' ছাড়া স্কুলের ফণ্ড থেকেও শ'-দুই পাব। আবার কি চাও!...সুধীরের জ্বর ছেড়েছে?

—হ্যাঁ।

ওদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্যামাচরণ গোল কোথায় তাহা জানাইল; বলিল,—কিন্তু গোল হচ্ছে রোজকার খরচ নিয়ে। চল্‌ছে না। চাল্‌টা কিন্‌তে না হ'লে, তবু কতকটা আসান্ হ'ত।

মহামায়ার মনে হইল বলে, "পৈতৃক সম্পত্তি এখন শিকায় উঠিল যে?"....কিন্তু বলিল না।

পাটের টাকার আরও কিছু খসিল—নবগৌরাঙ্গ সাহার চাউলের দোকানে কিছু টাকা অবিলম্বেই না দিয়া পারা গেল না। তারা স্পষ্ট

করিয়া এখনও কঠোর বা কটু কথা বলে নাই ; কিন্তু মুখের ভঙ্গীতে যেন আক্রমণের আভাস পাওয়া গেছে....

শ্যামাচরণ ভয়ে ভয়ে কুড়িটী টাকা লইয়া নবগৌরাঙ্গ সাহার হাতে দিয়া আসিল—পুনরায় কিছুদিন ধারে খাইবার পথ খোলসা হইল ; আর, শ্যামাচরণের মনে হইল, হাতে টাকা রাখা তার অদৃষ্টে নাই।

লাইফ-ইনসিওরের অফিস হইতে সুদের ছাপানো তাগিদ্ আসিল—সুদ নিশ্চয়ই দেওয়া গেল না....

শ্যামাচরণ হাসিয়া আপন মনেই বলিল, এরা সম্মুখে আসিয়া চোখ রাঙায় না, তাই রক্ষা।

তার উপর স্কুলের ছেলেরা যা' করিয়াছিল, সে কাজও বেশ পাকা—তারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল ; তাহারই ফলে মাহিনার টাকার কথা যেন ভাবিতেই পারা যাইতেছে না। কবে ধর্ম্মঘটের সম্পূর্ণ অবসান হইবে, এবং তাহাদের অসন্তুষ্ট অভিভাবকগণ স্কুলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বেতন দিতে সম্মত হইবেন, তাহা তাঁহারাও জানেন না, জানেন ঈশ্বর....

ঈশ্বরকে যখন ঠিক মনে পড়িয়াছে, এবং মনে পড়িয়া নিঃশ্বাস জমিয়া জমিয়া উঠিতেছে, তখন একদিন প্রাতঃকালে মহামায়া আসিয়া শ্যামাচরণের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শ্যামাচরণ অত্যন্ত উড়ুউড়ু মন লইয়া তার প্রিয়তম পুস্তক বিল্বমঙ্গল নাটকখানা পড়িতেছিল—সম্মুখে স্ত্রীর কণ্ঠধ্বনি হইতেই সেদিকে তার মন গেল—তাহারই উদ্দেশে উচ্চারিত শব্দগুলি তার কানে গেল ; কথার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেও বিলম্ব হইল না।

মহামায়া বলিল, একেবারে চাষা গরিবের ঘরে বিয়ে হ'লে এর চাইতে বোধ হয় ভালই হ'ত—বাঁদীগিরি করে' খেতাম ; নাই-নাই করে' রোজ-রোজ এত রক্ত বোধ হয় শুকতো না।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইয়াছেন ; কিন্তু তিনি তা' বুঝিতে পারেন নাই। ঐ রাখালই শ্রীকৃষ্ণ····

ভক্তবৎসল ভগবানের ঐ ছলনায় শ্যামাচরণের মন আগে দ্রব হইয়া চোখ ছলছল করিত ; কিন্তু আজ সে স্তিমিত চিত্তে অনুভবই করিল, কিছুমাত্র রেখাপাত হয় নাই····

তৎক্ষণাৎ সে মুখ তুলিয়া বলিল,—ঘট্‌ল কি ফের !

—কি ঘট্‌বে ? ঘটার কিছু বাকি আছে নাকি ! ভদ্দর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি ; কিন্তু ভদ্দরের দশা দেখে শেয়াল-কুকুরে কাঁদ্‌ছে !

—তা' জানি ত'····

—সব জান না ; কেবল জান যে, হালে পানি পাচ্ছে না। আমরা হয়েছি সকলের করুণার পাত্র। দরদ দেখা'তে এসে লোকে ঐ ছলে কেবলি মনে করিয়ে দিচ্ছে, তোমাদের মত দুর্দ্দশা কারও নয়····

—তা' ত' সত্যিই।

—কিন্তু কার দোষে ? পৈতৃক বাড়ী আর সম্পত্তি ত' চুলোয় গেছে —বাকি আছে প্রাণ ক'টি····

তোমার কথায় আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।

—তুমি কষ্ট পাচ্ছ' তোমার নিজের দোষে। কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি কার দোষে ? ছেলেমেয়েগুলো কষ্ট পাচ্ছে কার দোষে ? ভিখিরী মাগী এল, বল্‌লাম চা'ল বাড়ন্ত। সে আমার লম্বা সেলাই করা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে টিট্‌কিরি দিয়ে বলে' গেল' বাড়ন্ত নয়, মা, দেবে কোত্থেকে !····আমি বারবার দোহাই পাড়িনি' যে, আর কোথাও চাকরি খোঁজো ? পেয়েওছিলে ত' একটা। তা' গেলে না। এখন পৈতৃক বাড়ী মাথার উপর ভেঙে' পড়ুক, আর আমরা গুষ্ঠিশুদ্ধ ধন্য হই। তোমার মত অকেজো, নির্ব্বোধ আর কুনো স্বামী যেন আর কারও না হয়।

শ্যামাচরণের চোখ বিল্বমঙ্গল নাটক ছাড়া অন্যদিকে নিবিষ্ট হইয়া ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল ; বলিল,—ছেলে দু'টো বেকার হ'য়ে রইল—বিস্তর চেষ্টা....

কিন্তু মহামায়া তখন চলিয়া গেছে, এবং যাইবার সময়ে অসীম অবজ্ঞাভরে স্বামীকে যেন অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া গেছে।

মহামায়ার এই রোষ আর দোষারোপ নূতন নহে। তার একটি কথাও মিথ্যা নহে, তাহা শ্যামাচরণ শত শত বার স্বীকার করিয়াছে—ক্ষমাও চাহিয়াছে ; কিন্তু আজ যেন ঝাঁজ বেশী লাগিল—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় শ্যামাচরণ মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া রহিল—থর্‌থর্‌ করিয়া তার গা কাঁপিতে লাগিল....

শ্যামাচরণের পূর্ব্বাবস্থার রূপ, ছবি এবং ছায়া ঐরূপ—অবিরাম কম্পনশীল একটা নির্জ্জীব অস্তিত্ব।

এখন একেবারে হালের কথা :

মর্ম্মাহত অবস্থায় শ্যামাচরণ যখন দিনযাপন করিতেছে, অর্থাৎ ধুঁকিতেছে, তখন একদিন, ২৭-এ ফাল্গুনের পর, আসিল তার 'জয়ন্তী' নয়, তার বানপ্রস্থের, গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থানের বয়স—তার বয়স হইল একান্ন—একটা সম্মুখাভিমুখী দিবস হইতে যাত্রা শুরু করিয়া দেহটিকে ধারণ করিতে করিতে অর্দ্ধ-শতাব্দী সে উত্তীর্ণ হইল। একটি মাত্র শব্দে তার জীবনের এই দীর্ঘ ব্যাপ্তির ইতিহাস ব্যক্ত করা যাইতে পারে : অক্ষমতা।

কিন্তু রাধাচরণকে সে আর টাকা পাঠাইতে লেখে নাই ; এবং রাধাচরণ তাহাদের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার এই ভুলিয়া

যাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। বিদেশেই সে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছে ; গৃহস্থের গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সে সেখানেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে এবং আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা সে সম্ভোগ করিতেছে ; গৃহ নয়নানন্দ সন্তানসন্ততিতে পূর্ণ আর সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহারাই তাহার সমগ্র অন্তরের চিন্তার বিষয়—নিরবচ্ছিন্ন তাদের অধিকার। তার উপর, লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়া তাহার দৈনন্দিন আলাপ-পরিচয়, কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা চব্বিশ ঘণ্টাই চলিতেছে এমন সব লোকের সঙ্গে, যাঁহারা তার পরীক্ষিত পরম হিতার্থী, সুখ—দুঃখের সাথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, প্রীতির পাত্র, শ্রদ্ধেয়। জীবনের চতুঃসীমার এম্‌নি নিবিড় অব্যবহিত আবহাওয়া আর বন্ধন অতিক্রম করিয়া বহু দূরবর্ত্তী বাড়ীর কথা মনে করিতে বসা ঘটিয়া ওঠে না—তা' অসম্ভবই। নিজেকে লইয়াই সে বিব্রত না হইলেও, তাহাকে গ্রাস করিয়াছে বিদেশের অন্তরঙ্গগণ এবং সেখানকার গৃহ....

দাদা প্রভৃতির কথা হঠাৎ মনে পড়িলেও, মনেপড়াকে কার্য্যকর করিবার অবকাশই তার মেলে না। কখনও কখনও মনে হয়, ভালই আছেন বই কি....

এখন, এতক্ষণে, আসিল শ্যামাচরণের অঙ্গুষ্ঠের কথা—চিরকাল পরের উহা দেখিয়া দেখিয়া এইবার সে দেখাইবে।

একান্ন বৎসরে পড়িয়াই শ্যামাচরণ যেদিন মহামায়ার রোষে এবং দোষারোপে অধিকতর ঝাঁজ লাগিয়া অধিকতর মর্ম্মাহত হইল, সেইদিনই, ৩০-এ ফাল্গুন তারিখে, সে স্কুল হইতে ফিরিল জ্বর লইয়া ; জ্বর সামান্যই ; রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে সে খই আর বাতাসা খাইল। পরদিন সকালবেলা

উত্তাপ সামান্য একটু বৃদ্ধি পাইল ; কিন্তু তাহাতে কাজ বন্ধ রহিল না---একটু দুধ খাইয়া সে স্কুলে গেল····

তার পরদিন জ্বরের জন্য নয়, কেবল দৌর্ব্বল্যের দরুণ সে স্কুলে গেল না····

রাত্রে শুইতে যাইবার আগে মহামায়া তার কপালে হাত দিয়া দেখিল, জ্বরটুকু নাই—কপাল অল্প অল্প ঘামিতেছে—দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল····

এবং সকালবেলা গায়ের উত্তাপ দেখিতে যাইয়া মহামায়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—শ্যামাচরণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

মানুষের ইহলোক ত্যাগ করা অভিনব ব্যাপার কিছু নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে তা' ঘটিতেছে ; কিন্তু শ্যামাচরণের বেলায় একটা জায়গায় যেন একটু অভিনবত্ব দেখা গেল—

দেখা গেল, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত তার বুকের উপর রহিয়াছে—চারিটি অঙ্গুলী দেহসংলগ্ন—কেবল অঙ্গুষ্ঠটি একটু উঠিয়া আছে····

বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় প্রসারিত হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া আছে ; মুষ্টি খুব শিথিল, আর, অঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলিত হইয়া আছে····

কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না—

সবাই কাঁদিতে লাগিল।

কাপালিক ও মহাকালী

বটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর চোখ মুখ চেহারা আর ধারা ও ধরণ দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হইবে, একটা ব্যাপার কিছু বটে। সেই একটা-কিছু অসামান্য ব্যাপারের অপরিহার্য্য অঙ্গ গঞ্জিকা কিনা, বটকৃষ্ণের সম্পর্কে সে-কৌতূহল থাকাই অপ্রাসঙ্গিক ; কারণ, কারণ-বারির অভাবে গঞ্জিকা যে তন্ত্রমতে কালী-সাধনার অন্যতম প্রধান উপকরণ তাহা সবাই জানে ; এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বটকৃষ্ণ তা' লোকের সমক্ষেই অসঙ্কোচে আর সবিনয়ে স্বীকারই করে—

কিন্তু ঐ একটিবার—নিশীথে—পূজায় বসিবার প্রাক্কালে ; তখন তাহারই অব্যর্থ প্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী একটা অনুষ্ঠানোপযোগী সজ্জিত রূপ ধারণ করিয়া জাগ্রত হয়। বটকৃষ্ণের ঐ কথা লোকে বিশ্বাস করে কি না তা' জানা নাই।

ওটা তার জীবনের ঈপ্সামূলক সূক্ষ্ম ও নিঃসঙ্গ আরাধনার দিক্ ; তা' ছাড়া একটা স্থূল ও প্রকাশ্য ব্যবহারিক দিক যেমন সকলেরই থাকে তেমনি তারও আছে। সে এখানে একটি ছোট চায়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। কিন্তু এই দু'টি দিকের কোন্‌দিকে তার আন্তরিকতা বেশি এবং কোন্ দিকটা তার সম্মুখে উজ্জ্বলতর তাহা বাহিরের লোকের বুঝিতে চাওয়ার দরকার নাই—শরীর রক্ষার জন্য নির্ভরশীল সামাজিক এই দোকানটিকেই সে বড়ো করিয়া দেখে, কি, কায়মনোবাক্যে গার্হস্থ্য নিভৃত পূজাকেই সে শ্রেষ্ঠতর ক্রিয়া মনে করে তাহা বটকৃষ্ণ নিজে কখনও ঘোষণা করে নাই ; কিন্তু তা অজানা নাই। অবিরাম আনমনা ভাবে

থাকিয়া আত্মরক্ষায়, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের কাজে, তার উপরতি দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত উত্যক্ত অসহিষ্ণু হইয়া তার কোপনা স্ত্রী বরদার সখেদে এবং কথাবার্ত্তার রকমে তার খরিদ্দার প্রভৃতি বাহিরের লোকের সকৌতুকে মনে হয়, গাঁজা খাইয়া খাইয়া লোকটার মস্তিষ্কের দোষ দেখা দিয়াছে।

রেল ষ্টেশনের তারের বেড়ার বাইরে দক্ষিণে আর বাজারের উত্তর সীমানায় বটকৃষ্ণের চায়ের দোকান। তিনটি রাস্তার সংগম স্থলে বলিয়া শ্রান্ত পথিকের পক্ষে দোকানটি সুগম; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শ্রান্ত রেল যাত্রী কিংবা বাজার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত লোকের সমাগম সেখানে যত না হয়, বসিবার আরামপ্রদ আসন যথেষ্ট না থাকিলেও, শৌখিন যুবকবৃন্দের হয় তার আটগুণ—

তারা বলে, এমন মিষ্ট সম্ভাষণ আর স্বাদু পানীয় আর-কোথাও মেলে না।

সত্যই তা'ই—বটকৃষ্ণ ভারী মিষ্টভাষী, অতুলনীয় তার মিষ্টতা। খরিদ্দারকে সম্মান দানে বশীভূত করিতে কোনো দোকানীই কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু তার ভিতর ব্যবসায়বুদ্ধি বলিয়া একটা জিনিস থাকে, যা' চতুরতারই নামান্তর; কিন্তু বটকৃষ্ণের তা' নাই—তার মিষ্টতা স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ। কিন্তু তার দোকানের তেমন শ্রী নাই। দোকান ঘরের টিনেরই চাল, টিনেরই বেড়া, টিনেরই ঝাঁপ—বাঁশের চটায় পেরেক মারিয়া মারিয়া টিনসমুদয় পরস্পরের সঙ্গে আটকানো, আর এপিঠে ওপিঠে প্রচুর আলকাতরা মাখানো। ছ'পায়া লম্বা একটা টেবিল, আর তারই দু'দিকে ছোট ছোট চারখানা বেঞ্চি পাতা আছে—জন বারো লোক বসিতে পারে; টিনের চেয়ারও খান তিনেক আছে—দোকান খোলার পর তা' ঘরের বাহিরে রাস্তায় নামানো থাকে....

ছ'খানা কাচের তিনখানা কাচ ভাঙা একটা আলমারীও আছে—আর আছে চুল্লী কয়লা প্রভৃতি—

অধিকতর লোভনীয়ভাবে সুসজ্জিত এবং ইষ্টকালয়ে মনোরম চায়ের দোকান ওদিকে অনেক আছে, কিন্তু তরুণ ভদ্র সম্প্রদায়ের এইটাই পছন্দসই, কারণ, বটকৃষ্ণের চা উৎকৃষ্ট আর বটকৃষ্ণ স্বয়ং অত্যন্ত নম্র, মিষ্টভাষী আর সেবাপরায়ণ…

কিন্তু বটকৃষ্ণের চেহারা দেখিয়া অপরিচিত লোক যদি অন্য রকম অনুমান করিয়া ভীত হয় তবে তাদের অকারণ-ভীরু বলা চলে না ! বটকৃষ্ণের অতিশয় বলিষ্ঠ মিশ্‌কালো দেহ, খোঁপা-বাঁধা বাড়া চুল, লাল উজ্জ্বল চক্ষু, কপালে রক্ত চন্দনের সুবৃহৎ ফোঁটা, কনুইয়ের উপরে জড়ানো তিননর রুদ্রাক্ষের মালা, আর মজবুত দাঁত দেখিয়া মনে করা কঠিনই যে, লোকটি মাটির মানুষ। ঐ সব লক্ষণ দেখিয়া কে একজন তার নাম দিয়াছিল কাপালিক—বটকৃষ্ণের বেলায়-হাস্যকর ঐ নামটি বাজারে চলিয়া গেছে। যে-ব্যক্তি নির্বোধ নয়, অথচ নিরীহ ও প্রফুল্ল এবং নির্ব্বিবাদী আর মিশুক তাহাকে লোকে ভালো না বাসিয়াই পারে না।

কিন্তু তার চায়ের দোকানের জনপ্রিয়তার আসল কারণটি বলাই হয় নাই : "পয়সা রইল হে" বলিয়া যখন তরুণ গ্রাহক চায়ের পিয়ালা নাবাইয়া দিয়া ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে দোকান ত্যাগ করে তখন বটকৃষ্ণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরায় না ; তবে হিসেবের খাতায় লিখিয়া রাখে, এবং ঘুণাক্ষরেও তার তাগিদ নাই….

এখানে খরিদদার ছুটিবে না ত' ছুটিবে কোথায় !

এই সব পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তি কি করে, কাজের মতন কাজ করে কি না, পয়সা রহিতে রহিতে বেশি রহিয়া গেলে পরিশোধ করিতে ওরা সমর্থ কি না, ইত্যাদি বড়ো বড়ো জাহাজের খবর ক্ষুদ্র বটকৃষ্ণ জানে না ; কিন্তু

এদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া দেশী বিদেশী সিনেমা-নটীদের নাম আয় ব্যয়ের পরিমাণ, রূপসম্পদের ন্যূনাধিক্য, প্রকৃত বয়স, অভিনয়ের ক্ষেত্রেই যৌন-বোধ জাগ্রত করিবার উদ্যম এবং তার সাফল্য কতটা, ইত্যাদি বিষয় এবং সে বিষয়ে মতানৈক্যের ধারা ; এবং কোন্ চলচ্চিত্রটি কোন্ কোম্পানীর শ্রেষ্ঠতম অবদান, তাহা বটকৃষ্ণের কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। হাস্যরস উৎকৃষ্ট কি করুণরস উৎকৃষ্ট, সকল বেদনা আর প্রেরণার মূলে থাকে যৌন-ক্ষুধা না মূর্চ্ছিত মনের শ্রমবিলাস, সঙ্গীতের ভাষা উপভোগ্য না সুর উপভোগ্য, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তর্কও বটকৃষ্ণ দু' কান ভরিয়া অনেক শুনিয়াছে। তেমন মেজাজের লোক হইলে বটকৃষ্ণ বিবিধ ঢঙের নাগরালিতে বহুপূর্ব্বে পরিপক্ক হইয়া উঠিত—

কিন্তু তা' সে হয় নাই।

মধুবাবুর উত্তেজনাপূর্ণ কথাগুলিই বটকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশি। মধুবাবু যখন উত্তেজিত হইয়া বলেন, "Easy morals help much to make a Star-এ কথা বলে কোন্ শালা?" তখন উত্তেজিত মধুবাবুকে বটকৃষ্ণের বীর মনে হয়; বলে মধুবাবুর কথার দাম আছে....

শুনিয়া সকলেই হাসে ; বিমান দত্ত বলে ইংরেজির তুমি কি বুঝলে, কাপালিক?

ইংরেজির সে কি বুঝিল তা' বটকৃষ্ণ বলে না ; হঠাৎ গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া যেন আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলে, মা···

বিশু মুখুজ্জে বলে, কাপালিকের দিব্যি তৈরী হাত।—তারপর চুকচুক করিয়া চায়ে কয়েকবার চুমুক দিয়া বিশু বটকৃষ্ণকেই বলে, ধন্য তোমার বাপ মা। তোমার বাড়ী কোথা হে?

বটকৃষ্ণ বলে, বাড়ী, বাবু, শান্তিপুরের কাছে।

—উ হুঁ। তোমার কথায় পূর্ব্ব-বঙ্গের টান আছে। বলিয়া বিশু পুনরায় জানিতে চায়, তোমার স্ত্রী আছে তো একটি?

—আছে, বাবু।

—ঠিক্ বিবাহিত স্ত্রী ত'?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু সাক্ষী ত' কেবল শালগ্রাম! তাঁকে জিজ্ঞেসা করবার উপায় নাই।

শুনিয়া সকলেই হাসে—

মধুবাবু উত্তেজিত হইয়া ইংরেজীতে বলেন, ঐ ক্লাসের লোকের ব্যাপার ত' জানোই মশায়। ঘাঁটিয়ে লাভ কি?

বটকৃষ্ণ চায়ের উচ্ছিষ্ট বাসন কুড়াইতে কুড়াইতে হঠাৎ থামিয়া যায়; মধুবাবুর দিকে বিহ্বলের মত তাকাইয়া কি যেন মনে করে···

আর জগদানন্দের তখন মনে হয়, বেচারা কাপালিককে ঝুলাইয়া রাখা উচিত হইতেছে না; হাসিতে হাসিতে বলে,—বুঝলে না বুঝি মধুবাবুর ইংরাজী? উনি বলছেন, তোমাদের মতো লোকের বিবাহিত স্ত্রী থাকে না। মধুবাবুর কথার দাম আছে, না?

মধুবাবুর কথার সে মূল্য না দেয় এমন নয়; হঠাৎ গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া যেন আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলে, মা···

—কেবল মা মা! ঘোর কাপালিক। দেখলেই আমার মনে পড়ে, অমাবস্যা আর মশান। বলিয়া শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করে, নরবলি দিয়েছ কখনো, কাপালিক?

—নিজে হাতে দেইনি; কিন্তু পড়ছে অহরহ। বলিয়া বটকৃষ্ণ হঠাৎ হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠে···

নরবলির কথায় তার সহসা নির্গত উচ্চ হাসিটা ওদের বীভৎস মনে হয়—

মধুবাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন,—অমন করে' হেসো না হে, ভয় করে। তারপর এই নাও চায়ের দাম। কিছু মনে ক'রো না, কাপালিক; তোমার স্ত্রী সত্যই বিবাহিতা স্ত্রী। বলিয়া মধুবাবু খুব গম্ভীর হইয়া থাকেন....

নারী সম্পর্কে বটকৃষ্ণ পবিত্রতা এবং সংযমের পক্ষপাতী—'খদ্দেরলক্ষ্মী'গণের ঐ সব শ্রীহীন ইঙ্গিতে তার ঈষৎ বিচলন ঘটে—কিন্তু বাহিরে তা' বুঝা যায় না, বলে,—তা'ই, বাবু। ছেলে একটা আছে—সে-ও আমারই।

—তার মানে?—সকল জিজ্ঞাসুর তরফে উপেন সরকার সবিস্ময়ে জানিতে চায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনুমানই যদি কর্‌তে হয় তবে ভালোর দিকেই কেন করব' না! পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, প্রত্যেকেই যে তার বৈধ বাপের সন্তান তা' সাধারণের অনুমান ছাড়া আর কি! এ নিয়ে কেউ তর্কও করে না, কেউ তা' প্রমাণ করতেও বসে না। আমার বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি আছে সে আমার স্ত্রী—শালগ্রাম তার সাক্ষী; তবু সেই নিঃশব্দ নারায়ণ শিলা প্রত্যক্ষকারী আছেন; কিন্তু ঔরসের সাক্ষী তা'ও নাই। বলিয়া বটকৃষ্ণ এমন অমায়িকভাবে হাসিতে থাকে যে তার তুলনা নাই....

শতদল সেন বলে,—কথা বেশ বলে ত' কাপালিক! এত কথা শিখলে কোথায় হে?

বটকৃষ্ণ যুক্তকরে বলে, আপনাদেরই কাছে, বাবু; আপনারাই আমার গুরু, পরম শিক্ষক। মা বলেছেন, তোর গুরু আর কেউ নয় রে—তোর গুরু দুনিয়ার মানুষ। মানুষকে সন্দেহ করিস্‌নে, আর ঠকাস্‌'নে।

—বেশ বলেছো। আমরা এখন উঠি। অতঃপর উক্ত খরিদদারগণ প্রস্থান করিতে থাকে; তখন পয়সা কিছু বটকৃষ্ণের তহবিলে আসে, কিন্তু চায়ের কাপের দ্বিগুন ত' তা' নয়ই, একচতুর্থ।

স্ত্রীর প্রসঙ্গে একটা ভদ্র প্রতিবাদের ভঙ্গী লইয়া বটকৃষ্ণকে দাঁড়াইতে দেখা গেছে—খুবই সঙ্গত সেটা; কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে স্ত্রীমান্ হিসাবে বটকৃষ্ণের ভাগ্য যেরূপ মানুষের তা' বাঞ্ছনীয় নয়। তার স্ত্রী বরদা দেখিতে সুশ্রী নয়, কিন্তু তা' ধর্ত্তব্যই নয়, কারণ, রূপলালসা বটকৃষ্ণের নাই। মানুষকে দিনের পর দিন অভিভূত করিয়া রাখে স্ত্রীর রূপ নয়, তার স্নিগ্ধতা; কিন্তু বরদার চরিত্রে স্নিগ্ধতার নিদারুণ অভাব দেখা যায়—বরদার মেজাজ ভারি খারাপ; ভারি আঘাত করে। বরদা যখন কুমারী কন্যা তখনই সে বাপ মা সমেত বাপের বাড়ীর লোকগুলিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত—চিহ্নে চিহ্নে তার কার্য্যকলাপের একটা অবিস্মরণীয় ইতিহাসই সেখানে সে রাখিয়া আসিয়াছে। কথায় কথায় ছিল তার রাগ—রাগিলে সে আচরণ করিত ঠিক্ উদ্দাম উন্মাদের মত; পিত্তল কাঁসা আছড়াইয়া ভাঙিয়া তছনছ করিত—তার সে-অন্ধতার বেগ সম্বরণ করিতে পারিত কেবল তার দাদা, মারিত।

এখন অবশ্য অতটা দুর্দ্ধর্ষ সে নয়—সে রকম অগ্নিকল্প মূর্ত্তি ধারণ করিলে এখন নিজেকেই ধ্বংসপথে লইতে হয়, তা' সে বোঝে; তবু বটকৃষ্ণকে সহ্য করিতে হয় বিস্তর—তাকে অটল অম্লান থাকিতেই হয়—

এবং আসক্তভাবেই অনুগ্রাহকগণকে আনন্দদানের আয়োজন তাহাকে প্রত্যহই করিতে হয়। বিশেষ উৎসাহের কারণ দাঁড়াইয়া গেছে ইহাই যে, তার দোকানে যাঁরা পদার্পণ করেন তাঁরা এখন 'ফেলো কড়ি

মাখো তেল’ বলা যায় এমন দূরবর্ত্তী গ্রাহক নয়, অল্পদিনের পরিচয়ের পরই তাঁরা এখন নিকট বন্ধু। এই বন্ধুর সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে····

কিন্তু বটকৃষ্ণই অকস্মাৎ একদিন বন্ধুগণের চোখের সাম্‌নে সরিষার ফুল ফুটাইয়া দিল—চা-তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ মধুবাবু, উপেন সরকার, চিরঞ্জীব বোস, অখিল গুপ্ত প্রভৃতি বটকৃষ্ণের দোকানের সাম্‌নে তাড়াতাড়ি আসিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং চমকিয়া উঠিল····

দোকান বন্ধ—টিনের ঝাঁপ ফেলাই আছে—

—এখন উপায়? উপায় জানিতে চাহিয়া অখিল গুপ্ত অসহায়-ভাবে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল···

চিরঞ্জীব বলিল,—উপায় নগদ খরিদ। উপেন সরকার বলিল,—সেটা একেবারে শেষ উপায়। অসুখ করেছে হয়তো—চলো দেখে’ আসি।

—কিন্তু কাপালিকের রূপ দেখে’ ত’ চায়ের তেষ্টা মিট্‌বে না! পরস্ত্রী নিরীক্ষণ করার বাসনা নেই ত’? বলিয়া উপেন সরকার গুরুত্বপূর্ণভাবে খানিক্ হাসিল।

—তা’ কি আর না আছে! বিবাহিতা স্ত্রী কি না তা’ বুঝে ফেলার সুযোগও দৈবাৎ মিলে’ যেতে পারে।

শুনিয়া সকলেই বটকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরো উদ্বিগ্ন হইয়া তার বার্ত্তাসংগ্রহে সম্মত এবং সচেষ্ট হইল।

বটকৃষ্ণের বাসা খুঁজিয়া লইয়া যখন তারা সেখানে পৌঁছিল তার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

হিমাংশু পাল এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল—ভারি নোংরা জায়গা ত’!

—তা’তে কি বয়ে গেল! বাড়ীর দরজাও বন্ধ—গা-ঢাকা দিল নাকি! বলিয়া অখিল গুপ্ত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল কাপালিক?

কেহ সাড়া দিল না।

চিরঞ্জীব বলিল,—নির্ব্বোধ একটা। বাড়ীর লোকে ঐ নাম জানে নাকি!

—তা, বটে। বটকেষ্ট?

সামনের দরজাটা একটুখানি খুলিয়া গেল—একটি বালকের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, কি বলব’, মা?

—বল্ যে পূজোয় বসেছেন; আজ এখনি বসেছেন। একটু দাঁড়ান আপনারা।

মায়ের শিখানো কথার পুনরুক্তি ছেলেটি করিল না তার দরকারও ছিল না। ছেলেটিই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল—ঘটনাটা ওদের বিস্ময়কর মনে হইয়াছে।

—যাক্; ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং—গলার স্বরেন কিঞ্চিৎ পরিচয়ং। বলিয়া উপেন সরকার স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হাসিতে লাগিল এমন ওস্তাদী ধরণে যেন ঐ কথাগুলো বলিতে পারা একটা কীর্ত্তি।

ঐ রকম কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক আরো কথাবার্ত্তা হইত বোধ হয়, কিন্তু তখনই সেই ঘরের ভিতর শব্দ হইল: মা, মা, মা। ওরা শুনিল, খুব গভীর গম্ভীর আর্ত্তনিনাদে কাপালিক মাকে আহ্বান করিয়াছে।

হিমাংশু পাল চোখ টিপিয়া বলিল,—কাপালিকের মাতৃপূজা শেষ হ’ল। কেউ ডাক হে।

কিন্তু কেহ ডাকিল না—ডাকিতে যেন পারিল না। ঐ মা মা ধ্বনির ভিতর কেমন একটা বেদনা আর শক্তি ছিল যাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই ঠেলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল না—নিষ্প্রয়োজনের তরল শব্দ ফুটিতে যেন সাহসই পাইল না....

তখনই দরজা খুলিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল তাদের কাপালিক—মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু হাসিলে তার দাঁত দেখা গেল—অত্যন্ত আনন্দের সহিত হাসিয়া আর চমৎকার অমায়িক ভাবে সে তার ভূতপূর্ব্ব লক্ষ্মীর দূত আর বর্ত্তমান বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিল; বলিল, কি সৌভাগ্য আমার! শুভক্ষণে আজ আমার ঘুম ভেঙেছিল। আসুন, আসুন। বলিয়া সে দরজা ছাড়িয়া পিছাইয়া দাঁড়াইতেই তার একটা রূপান্তর ঘটিয়া গেল—তার বলিষ্ঠ দেহ, রক্ত বসন আর দীর্ঘ কেশ অভ্যন্তরস্থ নিস্তেজ দীপালোকে কেমন যেন অপরিচিত রূপ লইয়া ওদের চোখে পড়িল—কাপালিক বলিতেই যে-মূর্ত্তি মনে পড়ে এ যেন ঠিক তা'-ই।

অখিল গুপ্ত বলিল,—বস্‌ব' না আমরা। আমরা ত' তোমার চায়ের জন্যে আসিনি।—বলিয়া খুব একটা রাজনৈতিক চালে'র উপর চায়ের কথাটা মনে করাইয়া দিয়া অখিল গুপ্ত বলিল, দেখতে এসেছি তোমার অসুখ বিসুখ করেছে কি না। অসুখ তো করে নাই দেখছি। দোকান বন্ধ রেখেছ যে?

বটকৃষ্ণ শব্দ করিয়া খানিক হাসিল, যেন দোকান বন্ধ করায় কাহারো দুঃখের কারণ কিছু ঘটে নাই। বলিল,—সে-গল্প বলছি, এসে বসুন আগে! বলিয়া বটকৃষ্ণ ওদিকে গেল—মাদুর আনিয়া তাড়াতাড়ি পাকা মেঝের পাতিয়া দিল, এবং বলিল, ভিতরে একবার দয়া করে' পদধূলি দিন, বাবু। গরীবের ভাড়াটে ঘর; আপনাদের—

ও'দের মতো মহাশয় ব্যক্তিগণের বসিবার উপযুক্ত স্থান এটা নয়, সেই দৈন্যই সে কেবল একটু হাসির সাহায্যে ব্যক্ত করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া রহিল....

আর ইতস্তত: করা গেল না; বিশেষ যখন চায়ের দোকানের মালিক আদর করিয়া বসিতে বলিতেছে তখন এক কাপ করিয়া চা দিয়া হিতৈষী এবং বৃহত্তর ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা নিশ্চয়ই করিবে।

সকলে ভিতরে উঠিয়া গেল, জুতা খুলিয়া জুৎসই হইয়া বসিল, এবং চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, দেখিবার যোগ্য কিছুই নাই, কেবল কালীর মূর্ত্তিটি আর তাঁর আসনটি ছাড়া। ছোট একখানি জলচৌকির উপর শিব চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি স্থাপিত—জলচৌকির পায়ার সঙ্গে সম্ভবত: পরেক মারিয়া চারিটি কাষ্ঠদণ্ড বসান হইয়াছে—সেই দণ্ডচতুষ্টয়ে একটি চমৎকার ক্ষুদ্র চাঁদোয়া খাটানো—পিতলের পিলসুজের উপর দুই পাশে দু'টি পিতলের প্রদীপ জ্বলিতেছে—দু' দিকের দুইটি ধূপদানি হইতে এখনো অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে—স্তূপীকৃত রক্তজবা রহিয়াছে মাতৃমূর্ত্তির চরণতলে—মূর্ত্তির বাম দিকে রহিয়াছে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত নৃমুণ্ড, আর দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে মানুষের হাতের অস্থির মতো কি একটা জিনিস। ভয়ঙ্কর কিম্বা একাগ্রচিত্তে বহুক্ষণ দেখিবার মতো কিছুই নহে, সুতরাং ওরা পূজারীর দিকেই মন দিল—

সুধাংশু জানিতে চাহিল,—তারপর বলো দেখি, দোকান কেন তুলে' দিলে?

বটকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল,—চল্‌ল' না যে!

—চল্‌ল' না! চলল না কি হে! তোমার চায়ের মতো কাটতি ত' কারো দেখিনে।

ঘটনা সত্যই, এবং বটকৃষ্ণ তা' অস্বীকার করিল না; অম্লানমুখে হাসিয়া বলিল,—আপনাদের অনুগ্রহে তা' বটে। কিন্তু আমি দুঃখ করেও বলছিনে, অভিযোগও করছিনে, দোষারোপও করছিনে, আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে কেবল খবর দেওয়ার মতো বলছি যে, কাটতি যদি নগদ হ'ত তবে দোকান তুলতে হ'ত না।—বলিয়া ওদের, তার বাবুদের, মুখের দিকে তাকাইয়া বটকৃষ্ণ এমন অকপট আর সৌজন্যব্যঞ্জক সরস হাসি হাসিতে লাগিল যে, সে যেন মনে করে, ধারে খাইয়া পয়সা না দিয়া মানুষের অন্নসংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ার মতো ভদ্রোচিত কাজ আর কিছুই নয়।

—ও, তা'ই বলো···

একজন একটা সুর টানিল বটে, কিন্তু তখন একটা ছায়া পড়িয়া সকলেরই মুখ অল্পবিস্তর ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

অখিল গুপ্ত তৎক্ষণাৎ সরলচিত্ত ভালোমানুষ সাজিল; চেঁচাইয়া বলিল,—আমাদের কাছেও ত' কিছু কিছু পাবে হে। খোলো খোলো, দোকান খোলো। খুললে তবু আদায় হবার আশা আছে; না খুললে ত' সবই ডুবলো।

সুধাংশু পাল বলিল,—তেড়ে' ধরো—কড়া কড়া শোনাও—আপনি আদায় হবে।

চিরঞ্জীব বলিল, তা'ই করো, কিন্তু আমাদের বাদ দিয়ে। বলিয়া সে বুদ্ধিমানের মতো খুব জোরে একবার হাসিল।

কিন্তু লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার ইচ্ছা বটকৃষ্ণের আছে কি না তা' বুঝা গেল না; বলিল,—আচ্ছা, দেখি। দয়া করে' একটুখানি অপেক্ষা করুন 'আমি চা করে' আনি।

—আনো।

—হ্যাঁ আনি। বলিয়া যেন পয়সা আদায়ের কথাটা চাপা দিতেই বটকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

ওরা গল্প করিতে লাগিল: এবারকার টাউন ফুটবল টিমটা তেমন শক্তিযুক্ত করিয়া গঠন করা সম্ভব হয় নাই—নিতাই রক্ষিত এবং সন্তোষ চৌধুরী চলিয়া যাওয়ায় রক্ষণভাগ আঁট ভাঙিয়া এমন দুর্ব্বল হইয়া গেছে যে, আসান্‌সোলের সঙ্গে পারিয়া উঠা শক্তই হইবে···

ঐ বিষয়টি পল্লবিত করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় ওরা চমকিয়া উঠিল—দৃশ্যের যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু ঘটনা সাংঘাতিক কিছুই নয়—ঘরের ভিতর ছায়া এবং আলো দুইই পাশাপাশি হইয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। দেখা গেল, প্রদীপের তেল ফুরাইয়া শিখা একবার বাড়িয়া একবার কমিয়া ক্রমাগত দপ্ দপ্ করিতেছে; কিন্তু সেই চঞ্চল আলোকে আর-একটা ব্যাপার যা' ওদের চোখে পড়িল তা' অসামান্য: কালীর মূর্ত্তিটা যেন আন্দোলিত হইতেছে—কেবল তা'ই নয় উজ্জ্বলতর আলোকে একবার ঊর্দ্ধ দিকে প্রসারিত হইয়া পরক্ষণেই নিস্তেজ আলোকে যেন সর্ব্বাঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে····

আলো ও ছায়ার চাঞ্চল্যজনিত দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া তা' আর-কিছুই নয়; কিন্তু ওরা একটু ভয় পাইল—মধুবাবু উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—দেখছ,' মূর্ত্তি যেন ছোট বড় হ'চ্ছে!

দুই তিনজন একসঙ্গে বলিল,—হুঁ'।

সকলেই একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল—এবং মুহূর্ত্ত দুই পরেই প্রদীপ দু'টি প্রায় একসঙ্গে নিবিয়া গেল, আর, অকারণেই ওদের মনে হইল, কৃষ্ণতনু মূর্ত্তি যেন সেই গভীর অন্ধকারের সুযোগে উন্মুক্ত দ্বারপথে দ্রুতগতি পলায়ন করিবে।

চিরঞ্জীব চিৎকার করিয়া উঠিল,—বটকেষ্ট আমরা অন্ধকারে ব'সে আছি—আলো নিবে' গেছে, লণ্ঠন আনো শীগ্‌গির।

বটকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, যাই, বাবু। বলিয়াই লণ্ঠন লইয়া সে দৌড়াইয়া আসিল, এবং ওরা সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিল মূর্ত্তিটিকেই—মূর্ত্তি তেম্‌নি আছে, অর্থাৎ অবস্থিতির এবং অবয়বের একতিল ব্যতিক্রম হয় নাই।

উপেন সরকার হাসি ফুটাইয়া বলিল,—আমরা ভয় পেয়েছিলাম, কাপালিক। তোমার কালীমূর্ত্তি যেন নড়ে' উঠেছিল!

বটকৃষ্ণ কালীর দিকে তাকাইল না; বলিল,—মা আমার জাগ্রত....

—চা হ'লো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দু'মিনিট। বলিয়া বটকৃষ্ণ চলিয়া গেল, এবং দু'মিনিটের ভিতরেই চা আনিয়া হাজির এবং পরিবেশন করিল।

চা ওঁরা পান করিতে লাগিলেন—তৃষিত কণ্ঠ শীতল আর ম্যাজমেজে গা সুস্থ হইয়া উঠিল।

বটকৃষ্ণ বড় কুণ্ঠিত হইয়া দীনতম সেবকের মতো দাঁড়াইয়াছিল—বাবুদের প্রফুল্লতা দেখিয়াও সে তৃপ্তিবোধ করিতে পারিল না; বলিল,—শুধু চা, বাবু; আপনাদের সেবা করে' আমার একটুকুও তৃপ্তি হ'ল না।

—আর একদিন কিছু জলখাবারও দিও; কিন্তু তোমার দোকান যে ফেল করল' সেইটাই হ'ল বড় দুঃখের কথা।—অখিল গুপ্তের এই অনুকম্পা আন্তরিক নয় বলিয়া সন্দেহ করা চলে না। অনুকম্পা প্রদর্শন শেষ করিয়া সে পুনরায় বলিল,—কি ক'রে আবার তোমাকে দাঁড় করাই বলো ত'!

হিমাংশু পাল বলিল,—বাকিটা সম্পূর্ণ আদায় করা ছাড়া আর উপায় কি! তোমার হিসেব আছে?

বটকৃষ্ণ বলিল,—আছে।

—তবে ত' আদায় হবেই।

কিন্তু বটকৃষ্ণের মত তা' নয়; বলিল,—মা বলেছেন, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোলপাড় করিস্‌নে....

শুনিয়া সকলেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; মধুবাবু উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—তবে অনর্থক হিসেব রেখেছ কেন?

বটকৃষ্ণের মুখে চমৎকার স্বচ্ছ একটু হাসি দেখা দিল; বলিল,—পাওনা কত কেউ জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না যদি হিসেব না রাখ্‌তাম—বড় লজ্জা পেতে হ'ত'।

উপেন সরকার বটকৃষ্ণের সম্বন্ধে মন্তব্য করিল, নাঃ আশা নেই।

ভিতর দিক্‌কার দরজাটা নড়িয়া উঠিল; বটকৃষ্ণ বলিল, যাই। বলিয়া সেইদিকে যাইয়া ডিশে করিয়া আনিল স্থপারি আর লবঙ্গ—ওদের সাম্‌নে মুখশুদ্ধির সেই উপকরণ রক্ষা করিয়া বটকৃষ্ণ পুনরায় কুণ্ঠা ও বিনয়বশতঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···

এবং চা-পানের পর তাহা দেখিয়া শুধাংশু পাল না হাসিয়া পারিল না। ভীমের মতো বলিষ্ঠ দেহ, রক্তবসন, দীর্ঘ এলায়িত কেশ, রক্তচন্দনের বৃহৎ ফোঁটা, শুভ্র উপবীত আর রুদ্রাক্ষশোভিত বাহু সমেত সমগ্র চেহারার সঙ্গে তার এই বিনয়ে খর্ব্বতা ধারণের যেন কিছুমাত্র সামঞ্জস্য আর সার্থকতা নাই; বলিল,—কাপালিক, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার ভালো লাগ্‌ছে না···

—কেন, বাবু? কোন অপরাধ করেছি বুঝি। বলিয়া বটকৃষ্ণ আরো নত আর বিভ্রান্ত হইয়া গেল।

—কিছু না। তোমার ছেলেটিকে দেখলাম না ত'?

বটকৃষ্ণ হাসিল; বলিল,—বেয়াড়া ছেলে। অপরিচিত লোকের

সাম্‌নে আস্‌তে তার ভারি ভয়। কিছুতেই আপনাদের কাছে তাকে আনা গেল না।

—আচ্ছা, এখন উঠি। চায়ের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু দোকান আবার খোলো। পয়সা আদায় হবে না এ কি একটা কথা!

অখিল গুপ্তের ঐ কথার সারবত্তা আর স্বার্থের দিক্‌টা সকলেই সানন্দে স্বীকার করিল···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা'-ই করো।

সমস্বরে উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়া ওরা গাত্রোত্থান করিল।

বটকৃষ্ণ কেমন একটা আলস্যের সহিত কেবল বলিল,—আচ্ছা।

"আচ্ছা" বলিয়া সায় দিয়া বটকৃষ্ণ আন্‌মনা হইয়া যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল—এবং তারপরই ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ভার লইল নিয়তি—মনে হয় তা'-ই; নৈমিত্তিকভাবে ঘটনার সূত্রপাত হইয়া পরিণাম যা' দেখা দিল তা' যেমন আকস্মিক তেম্‌নি অনুচিত আর মারাত্মক····

স্বামীকে একলা পাইয়া বরদা আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীর সম্বন্ধে বটকৃষ্ণের প্রেম বিরাগ বিদ্বেষ লজ্জা প্রভৃতি কোনো অনুভূতিই নাই, ক্রোধ ত' নাই-ই—কিন্তু তার এখনকার আচরণের কারণ তা' নয়, অবহেলাও নয়—সে অন্যমনস্কভাবেই বুকের উপর দুই হাত শৃঙ্খলিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া কালীমূর্ত্তির দিকে নিবিষ্ট চক্ষে তাকাইয়া রহিল····

কিন্তু ঐ দৃষ্টি হইল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বরদা বলিল,—ওদিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছ?

বটকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল,—মাকে···

—তোমার সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাইনে, এই আমার শেষ কথা।

বরদার রূপ নাই। পিত্রালয়ে লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছিল—শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের কথা এখনও তার মনে পড়ে, কিন্তু তার রূপহীনতার অপরাধে বিবাহ হইয়াছিল বটকৃষ্ণের সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত সুলভে। শিক্ষাক্ষেত্রে বটকৃষ্ণ একেবারে অনুজ্জ্বল, এবং পয়সার দিক্ দিয়া তখনই তার অস্তিত্ব নামমাত্র। নিজের চেষ্টায় সাংসারিক অবস্থা অভাবহীন করিয়া তুলিতে পারিলে হয়তো কোনো কথাই উঠিত না; কিন্তু তা' নয়, সুতরাং কথা উঠিল—কেবল উঠিল নয়, ছুটিল, বিদ্ধ করিতে লাগিল—মর্ম্মে জ্বালা বহন করিয়া বরদা অপরাধীকে মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইতে লাগিল—কিন্তু বটকৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট; সে কেবল স্বার্থ ত্যাগই করে, অন্ন সংগ্রহ করে না।

বলা বাহুল্য, ঐরূপ যখন পূর্ব্বের ইতিহাস তখন বটকৃষ্ণ কোপনা স্ত্রীর মুখে জ্বলন্ত ভাষায় ভৎসনা আর ব্যাখ্যা বিদ্রূপ শুনিতে অভ্যস্ত; কিন্তু আজ বরদা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল....

বটকৃষ্ণ বলিল,—নোতুন করে' আজ তোমার কি হ'ল!

নোতুন কিছুই নয়; পুরনো কথাই বলছি। বিয়ে করে' এনে এম্‌নি করে' তুমি আমাকে চিরকাল কষ্ট দেবে? কিন্তু কাকে বলছি আমি! তুমি যে গাঁজাখোর....

বটকৃষ্ণ অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া বরদার কথার ঝঞ্ঝা সম্বরণ করিতেছিল—ঐ কথায় সে বরদার মুখের দিকে তাকাইল...

বরদা বলিতে লাগিল,—বাবুদের কথা সব শুনেছি। পয়সা আদায় কর্‌তে তুমি চাও না। ভালোমানুষ ভক্ত সেজেছ—তুমি ভালোমানুষ, যেমন ভালোমানুষ গরু আর গর্দ্দভ।...তোমার অন্ন বস্ত্রের দরকার নাই; কিন্তু আমার ত' আছে। আমি আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জানিবারণ কর্‌ছি....

বরদার এ কথাগুলি সাংঘাতিক নির্ম্মল সত্য।

বটকৃষ্ণ চক্ষু দু'টি এক নিমেষের জন্য মুদ্রিত করিল—অন্ধকার দেখিতে কেমন তাহাই বোধ হয় সে দেখিয়া লইল; দেখিয়া লইয়া অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—আর বলো' না....

কিন্তু বরদা বলিতেই আসিয়াছে—অগ্ন্যুদ্গিরণ চূড়ান্ত না করিয়া আজ সে থামিবে না—অভ্যাগতগণের সঙ্গে স্বামীর কথোপকথনে আজ সে ইন্ধন পাইয়াছে প্রচুর।

বরদা বলিতে লাগিল,—নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া না হ'লে এমন কথা কেউ বলে! তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মা তোলপাড় করতে নিষেধ করেছেন! তিনি চান্ না যে, তুমি স্ত্রী পুত্রকে ভাত কাপড় দাও! পয়সা হ'ল তুচ্ছ! তা' আদায় করে' কাজ নাই। এমন নির্ব্বোধ অপদার্থ আল্সের হাতে আমাকে দিয়েছিল টাকা খরচ করে'! মরণ তোমার। কেষ্টনগরে ছিলে—ফাঁকি দিয়ে সবাই খেলে। টেনে নিলে রাণাঘাটে—সেখানেও দেখলাম তা-ই। ভক্তবিট্‌লে আহাম্মোক কোথাকার—অষ্টপ্রহর মা মা মা....নেশা করে' করে' পাগল হ'য়ে ঐ দাঁড়িয়েছে খেয়াল। নেশাখোরের মুখে ছাই ছাড়া আর কি দেবে দেবতা আর মানুষ!

বটকৃষ্ণ বলিতে যাইয়া থামিয়াই বলিল,—মায়ের নামে মিথ্যা বলো না।

—খবরদার, নেশাখুরী আর ভণ্ডামী আমি ঢের সয়েছি—এ-যন্ত্রণা আমি আর সইব না। বোকা আর কুঁড়ে পেয়ে দুনিয়ার লোকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে পথের ভিখিরী বানিয়ে দিলে—সন্তান যাচ্ছে অনাহারে শুকিয়ে—মা রাখছে না কেন?

—তা' মা-ই জানেন....

বলিতে বলিতে বটকৃষ্ণ থামিয়া গেল—বরদা তখন ছুটিতেছে; কি

সে করিতে যাইতেছে তাহা বটকৃষ্ণ অনুমান করিবার পূর্ব্বেই বরদা কালীমূর্ত্তি আসনের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া চক্ষের পলকে তাহাকে শানে নিক্ষেপ করিল—মাটির মূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গেল—মায়ের হস্ত পদ মস্তক মুণ্ডমালা, শিব প্রভৃতি অংশ ছিট্‌কাইয়া কোন্‌টা কোথায় পড়িল তার উদ্দেশ রহিল না—কেবল, যে-স্থানে মূর্ত্তি মৃত্তিকায় প্রহত হইয়াছিল সেখানে দেখা যাইতে লাগিল পিঙ্গল খানিকটা ধূলা আর রক্তবর্ণ জিহ্বাটা····

—কর্‌লে কি! কর্‌লে কি! সর্ব্বনাশ করলে। বলিতে বলিতে আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বটকৃষ্ণ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল····

বরদা বলিল,—আমি চল্‌লাম। মরার পরও তোমার সঙ্গে যেন আর দেখা না হয়।

তারপর হুঁশ ফিরিয়া বটকৃষ্ণ যখন উঠিল তখন বরদা সেখানে নাই—ছেলের হাত ধরিয়া সে বাহির হইয়া গেছে।

বটকৃষ্ণ দোকান আর নিশ্চয়ই খোলে নাই।

এই নগণ্য অনাবশ্যক জীবনের আশ্রয় বলিতে যাহা সে বোঝে তা' স্ত্রী নয়, পুত্রও নয়, অর্থও নয়, ঐ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি—যা' ভাঙিয়া দিয়াছে তাহারই স্ত্রী। সে বিশ্বাস অবিশ্বাস কাহাকেও করে না—তবু মানুষের মনের সহজ ধর্ম্মের নিরন্তর পরাভবে সে পীড়া বোধ করে—মনের নিভৃতে মাঝে মাঝে খুবই অনুভব করে, যে-মূল গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিয়া সংসারের সঙ্গে সংলগ্ন রাখে তাহা শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। ছল চাতুরীর প্রতিরোধ করিবার উপায় তার জানা নাই—মিথ্যাচারিতার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তার মনে হয় না—আপন গণ্ডা আদায়

করিতে গেলে শান্তিভঙ্গ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ কলহে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে মনে হইতেই তার শরীরে শিহরণ দেখা দেয়। মানুষ মানুষের মুখাপেক্ষী সর্ব্ব বিষয়েই—জীবনের শান্তি সার্থকতা সম্ভোগ এবং মূল্য সেই মুখাপেক্ষিতাই, অর্থাৎ প্রেম ; কিন্তু ঐ মুখাপেক্ষিতাই যদি দিবা-রাত্রব্যাপী উদ্বেগ আর বিরোধের হেতু হইয়া ওঠে তবে নিঃস্পৃহ হইয়া মাকে ডাকা ছাড়া আর মায়ের হাতেই ফলাফল রক্ষিত মনে করা ছাড়া আর উপায় কি। নিরবলম্বন নিমজ্জমান্ প্রাণের ঠাঁই একটা চাইই।

কিন্তু তার এই ঠাঁইটি ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া গেছে তারই স্ত্রী—মাকে সে অপমান করিয়াছে—

বটকৃষ্ণের বুক ফাটিয়া চৌচির হইতে চায়, তার চোখ ফাটিয়া জল পড়ে....

দু'টি দিন অতিবাহিত হইল, বটকৃষ্ণ জপে বসিল না—স্নানাহার করিল না—ভয়ে মা শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিল না—মায়ের কাছে ক্ষমা চাহিতে পারিল না—লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না, এবং স্ত্রী বরদা পুত্র লইয়া কোথায় গেল তা' একটুও ভাবিল না—প্রতিমার ভগ্ন অংশগুলির গায়ে হাত দিতে পারিল না, অথচ রক্তবর্ণ সেই জিহ্বাটির দিকে চোখ পড়িলেই তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয় ; মনে হয়, নিষ্ঠুরতম আর অজ্ঞানতম এমন ধ্বংস পৃথিবীতে আর ঘটে নাই—মায়ের রক্তাক্তপ্রাণ ঐ জিহ্বার আকারে ওখানে জমাট বাঁধিয়া আছে।

তার জনৈক খরিদদার হরলাল রায় একদিন জানিতে চাহিয়াছিল : কি খেয়ে শরীরটা এমন পুষ্ট নধর করে' তুলেছ, কাপালিক ? বলো দেখি শুনি—সেই ব্যবস্থা কর্‌তে পারি কি না !

বটকৃষ্ণ বলিয়াছিল : মায়ের দুধ খেয়ে, বাবু ; মা আমাকে প্রত্যহ দুধ খাওয়ান্। বলিতেই বটকৃষ্ণের অঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল।

কিন্তু তা' কেউ দেখে নাই—

হরলাল পুনরায় বলিয়াছিল : দুধ আমরাও না খাই এমন নয় ; তবু ত' শুক্‌নো গতর তাজা হ'ল না !

—হবে, ধ্যান করুন। বলিয়াই বটকৃষ্ণ রহস্যপ্রিয় অনধিকারীর সঙ্গে আর চর্চ্চা করে নাই।

বটকৃষ্ণের সেই সুস্থ শরীর শুকাইয়া উঠিতেছে—সকল অবয়ব যেন চুপসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে !

বটকৃষ্ণের সকলের চাইতে প্রণয় জন্মিয়াছিল বনমালী অধিকারীর সঙ্গে। বনমালী বয়সে ছোট, কিন্তু তারই মতো মাতৃভক্ত ; বটকৃষ্ণে একটু অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়া বনমালী তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

বনমালী এখানে ছিল না—আসিয়াই সে লোকের মুখে শুনিল যে, কালীপ্রতিমা ভাঙিয়া দিয়া বটকৃষ্ণের স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছে ; শোকাহত স্তম্ভিত বটকৃষ্ণ অনাহারে থাকে···

তার ঘরের ভিতর এবং তার দিকে উঁকি মারিয়া প্রতিবাসী অনেকেই দেখিয়াছে, বটকৃষ্ণ কেবল মাথা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে····তারা দেখিয়াছে, কেহ ডাকিলে সে মুখ তোলে না ; মুখ তোলে ত' চোখ বুজিয়া তোলে, চোখের পাতা কাঁপে, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চোখ খোলে, যেন চোখ খুলিলেই অতি নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর একটা-কিছু চোখে পড়িবে—

কেহ দেখা দিলে বলে, এখানে দাঁড়িও না, ভয় আছে। দেখছ না, মহাকাল ক্ষিপ্ত হয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁর সঙ্গে লড়ছি ; তিনি মৃত্যু চান, আমি চাই প্রাণ···

শুনিয়া কেউ মুখ টিপিয়া হাসে, কেউ বিমর্ষ হয়।

এই বিবরণ শুনিয়া বনমালীও অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিল—তার মনে হইল, বটকৃষ্ণকে প্রবোধ দিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে হইবে; ভাবপরায়ণ কোমল প্রকৃতির লোক—ভাবের ঘরে আঘাত লাগায়, আর স্ত্রী অন্নাভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় বেচারার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং খানিক দিশেহারা হইয়াছে; বুঝাইয়া বলিলেই তার এ ঝোঁকটা কাটিয়া যাইবে। ঐ সব চিন্তা করিয়া শীতের সন্ধ্যায় একটা প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন লইয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ বনমালী বন্ধুকে দেখিতে আসিল....

বটকৃষ্ণ অন্ধকারে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিল; মুখ তুলিয়া বনমালীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, এস বনমালী; খবর আছে।

বনমালী বলিল, খবর শুনেই এলাম....

—সে-খবরের তুমি জানবে কি!—বলিয়া বটকৃষ্ণ আবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

বনমালী আর-একটু আগাইয়া গেল, আর-একটু জোরে বলিল,—তুমি নাকি খাও না দাও না; কি-সব বলো যার মানে নাই। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি!

—না। আর হলেই বা কি! মা আমাকে আগলে আছেন—তিনি এসেছেন, বনমালী। শোন, খানিক কান পেতে থাকো। বলিয়া সে নিজেই খানিক উৎকর্ণ হইয়া রহিল....বলিল, মা এসেছেন তা' কেউ জানে না, জানে কেবল শিবাকুল আর ফণী—শিবাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশান পানে ছুটেছে—তাদের লক্ষ লক্ষ পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?

তাকে নিরস্ত করিতেই বনমালী বলিল, পাচ্ছি।

—আর অর্দ্ধদেহ কুণ্ডলিত, অর্দ্ধেক দেহ শূন্যে তুলে' ফণী ফণা দুলাচ্ছে— অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে; মা অসংখ্য প্রেতাত্মা সঙ্গে এনেছেন; তারা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বনমালী তুমি পালাও।

বনমালী কাতর হইয়া বলিল,—তোমার হাতে ধরি, বটো, তুমি থামো। বেজায় মাথা-খারাপের কথা বলছ, তুমি তা' জানো না....

—গুরু গুরু মেঘ ডাকছে; কাল পারাবার আজ উত্তাল—তার কলধ্বনি শোনো। মা এসেছেন বলে' সৃষ্টি টলে' গেছে; কিন্তু মা ত' আজ ভীষণা নয়, মা আজ মনোহরা—চক্ষু দু'টি স্নেহামৃতে পূর্ণ—মায়ের ফুল্লাধরে হাসি খেলছে; মায়ের দেওয়া ক্ষীর পান করে' সুখে আমার শরীর অবশ হ'য়ে চোখ বুজে' আসছে, বনমালী। ঘুম পাড়াতে মা আমায় কোলে নিয়ে কেবল দোল দিচ্ছে। বলিয়া বটকৃষ্ণ সম্মুখে পশ্চাতে দুলিতে লাগিল....

বনমালী বলিল, হুঁঃ।....তার মনে হইল, ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, চলো একটু বেড়িয়ে আসি। আমার ওখানেই এ-বেলা দুটি খাবে তুমি—তোমার বউমা খুশী হবে।

বটকৃষ্ণ বলিল, যাবো। তোমার ছেলেপিলে সব ভাল আছে?

—ভালই আছে।

—তাদের কথায় বড় আনন্দ হয়; তাদের বুদ্ধি ফুরায় নাই—তারা নির্ম্মল।

বটকৃষ্ণের স্বাভাবিক কথায় আশান্বিত হইয়া বনমালী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; কাকুতি করিয়া বলিল,—আমার গা ছুঁয়ে বলো, অমন বীভৎস কথা ভাববে না....

—আমি ভাবব' বলে ভাবিনে ত'—আমাকে কে ভাবায় যেন। মনে হচ্ছে কি জান? আমার ছেলে, ধর্ম্মের সেই দান, বড়ো অভিমান নিয়ে চলে' গেছে।

—মা ছেলেকে নিয়ে চলে' গেছে—আবার দু'দিন বাদেই এসে পড়বে; তা' ভেবে' তুমি মন খারাপ করো' না। অভাবের সংসারে

স্বামী স্ত্রীতে বচসা হয়ই—রাগ করে' স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়া ত' হামেশাই দেখছি। বলিয়া বনমালী টানিয়া টানিয়া খানিক হাসিল—যদি তারই হাসিতে এই বিসদৃশ আবহাওয়াটা একটু স্বাভাবিক পথে আসে....

কিন্তু তা' আসিল না—

বটকৃষ্ণ বলিল,—উঁ হুঁ, তারা আর আসবে না—আসতে পারেনা। তুমি কি অন্ধ? দেখছ না, ঐ মায়ের জিহ্বা! মাঝখানে রক্তের নদী বইছে; ওপারে দাঁড়িয়ে তারা আর্ত্তনাদ করবে, কিন্তু ফেনা আর তরঙ্গ পার হ'য়ে আমার কাছে তারা আসতে পারবে না।

—যাঃ। চলো, ওঠো। বলিয়া বনমালী তার হাত ধরিয়া টানিল।

বটকৃষ্ণ উঠিল; বনমালীর সঙ্গে তার বাড়ীতে গেল; খাইল। তারপর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া শুয়াইয়া দিয়া বনমালী সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল।

তারপর দিন সমস্তটা দিন বনমালী নিজের কাজে ব্যস্ত থাকিল, এবং আশা রাখিল যে, আহারান্তে সুস্থ মস্তিষ্কে যখন বটকৃষ্ণ নানান্ কথা বলিয়াছে তখন আর ভয় নাই—তার পাগলামি ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর বনমালী দেখা করিতে আসিল; দেখিল, ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে বটকৃষ্ণ বীরাসনে বসিয়া আছে, দেহ স্থির আর অত্যন্ত ঋজু—চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত আর স্তিমিত—গঞ্জিকার গন্ধে ঘর পূর্ণ—মন ধ্যানমগ্ন তা' সহজেই বুঝা যায়···

—বটো?

বনমালী ভাবিয়াছিল, সাড়া পাওয়া যাইবে না; কিন্তু বটকৃষ্ণ হাত তুলিয়া বনমালীকে নিঃশব্দ থাকিতে ইঙ্গিত করিল; মুখে বলিল—মা,

তোর কথাই সত্য। এমন অপমান আজ অবধি তোকে কেউ করে নাই। তোর নৃমুণ্ডমালা সত্যই শুকিয়ে গেছে। আবার নূতন করে' পর্....

বলিয়া চোখ খুলিয়া বটকৃষ্ণ বলিল,—বনমালী, মাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। আজ কোন্ তিথি?

বনমালীর মনে হইল, ঘোর উন্মাদ। বলিল,—অমাবস্যা।

—তাই মা আজ অন্য রূপে সেজে' এসেছে। কি বলছে জানো?

—না। তা' আমি জান্‌বো কেমন করে'?

মা বল্‌ছে, ওরে ছেলেরা, তোরা দেখ্‌ছিসনে, আমার গলার মুণ্ডমালা পচে শুকিয়ে গেছে যে! নোতুন একটা দে, তরতাজা রক্তমাখা কয়েকটি নরমুণ্ড। ...তুমি এখান থেকে যাও, বনমালী, পালাও। কল্পান্ত ঘট্‌ছে, আকর্ষিত কাল মায়ের মুখে প্রবেশ করছে—আর্ত্তনাদ আর জয়ধ্বনি উঠেছে পাশাপাশি হ'য়ে—আবর্ত্তনের টাল সাম্‌লাবে কে! বনমালী, তুমি গেলে না?

বনমালী বটকৃষ্ণের উত্তেজিত কম্পমান দেহের দিকে ভীতচক্ষে চাহিয়া বলিল,—তোমার মতো লোকের এ-অসংযম সাজে না, বটো। ওঠো, আজকেও তোমায় ডাক্‌তে এসেছি...

—মা-ও এসেছেন ডাক্‌তে। আমার মুণ্ড হবে তাঁর মুণ্ডমালার প্রথম মুণ্ড। মা একসঙ্গে দেবেন ভক্তির পুরস্কার, আর আমার গৃহে তাঁর অপমানের ক্ষমা; তুমিই রইলে সাক্ষী—

বলিতে বলিতে হাঁটুর তলা হইতে ক্ষুর টানিয়া লইয়া বটকৃষ্ণ কণ্ঠের এক প্রান্তে বিদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চাপ দিয়া দিয়া টানিয়া লইয়া গেল—

চক্ষের পলকে রক্তের প্লাবন ছুটিয়া আসিল—বনমালী উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া একলাফে ঘরের বাহিরে আসিল—লাফাইয়া লাফাইয়া আর মুহুর্মুহুঃ কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে মানুষ ডাকিতে লাগিল....

শঙ্কিতা অভয়া

মেয়ে শান্তিময়ীর জন্য জননী অভয়ার মানসিক চাঞ্চল্যের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, আর, চাঞ্চল্য এত যে তার অন্ত নাই—তার সেই উদ্বেগ আর ভীতি এত প্রবল আর অসহ্য যে সময় সময় বিভ্রান্ত অস্থির চিত্তে সে আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি লাভের কল্পনা করে....দিবারাত্র মেয়ের অশুভ পরিণাম চিন্তা করিয়া করিয়া তারই বিষে তার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে....

শান্তির বয়স সতেরো; অতিশয় সুশ্রী মেয়ে; শরীরের গঠন-নিবিড়তা এমন পূর্ণাঙ্গ চমৎকার সুস্থ যে, অভয়ার মনে হয়, তার তুলনা নাই; কিন্তু মনে হয় না যে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাকে নিরীক্ষণ কি আশীর্ব্বাদ করা যায়—তার রূপ আর দোষের কথা মনে হইয়া অভয়ার শরীর আতঙ্কে শিহরিত হইতে থাকে....

সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধকর তার চক্ষু দু'টি—মেয়ের চক্ষু ঠিক মায়ের অতীত দিনের চক্ষুর মতো—গাঢ়তম বর্ণে তা' গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির; মনে হয়, গভীরতার ভিতরে এমন চঞ্চল একটা স্রোত বহিতেছে যার লক্ষ্য নাই, ইষ্টকর গন্তব্য ক্ষেত্র নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে যার গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে....

অভয়ার অত্যন্ত ভয় এখানেই—

তার মনে হয়, মেয়ে যেন কেবলি ভাবে, কাজের বেলায় লঘু-গুরু ন্যায়-অন্যায় বলিয়া বাধা কিছু নাই; দেখিতে হইবে, কাজে দুঃসাহস চাই কতটা, আর, তাতে নূতনত্ব আর কৌতুক কতটা!

অভয়ার ভয়ের আরো কারণ শান্তির মনের লীলাপ্রিয়তা, যা'কে

বৈজাত্য বলা যাইতে পারে—উদ্ভট আর উৎকট যা' তারই দিকে তার অন্ধ আগ্রহ....আর, যত উদ্ভট আর উৎকট আলাপ তার আর কার সঙ্গে তা জানা নাই, কিন্তু বাপের সঙ্গেও।

অভয়ার আরো মনে হয়. মেয়েটির প্রকৃতি আর রুচি এমনি তরল আর স্খলিত আর নিম্নগামী যাতে তাহাকে কেবল গৌণ আনন্দের হেতু মনে হইয়া মুখ্য উল্লাসের দু'দিনের সহচরী হিসাবে লাভ করিতে পুরুষ লালায়িত হইয়া ওঠে—বিবাহের পাত্রী হিসাবে সে বিচার্য্য নহে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের গুরুতর কথা বিশেষ হয় না। কোন্ ঔপন্যাসিক দুঃসহ স্বাধীনতার সহিত পরকীয়া প্রেমে সিদ্ধিলাভের স্তবরচনাপূর্ব্বক যৌনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; কোন্ নর্ত্তকীর নৃত্যনিপুণতা ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়ার যোগ্য; কোন্ অভিনেতার কণ্ঠস্বর চমৎকার মাদকতাপূর্ণ আর স্বরগ্রামের প্রত্যেকটিতেই সমান খেলে, ইত্যাদি বিষয়ে অভয়া কি জানে! কিন্তু শান্তি তা জানে; বাপের সঙ্গে তর্ক করে; জিতিতে চায়....

ফুটবল, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, এমন কি, প্রেমের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত বাদ যায় না—

এমনও কি, "প্লেটোনিক্ লাভ"-ও তাদের অবাধ চর্চ্চার অন্তর্ভুক্ত—

গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চায়, বাবা, তা' কি সম্ভব?

—কি?

—তুমি শুনছ কি তবে! ঐ "প্লেটোনিক্ লাভ্"! স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হবে, অথচ স্ত্রী-পুরুষের নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হবে যা'তে তা' আদৌ ঘটবে না—তা' কি হয়?

কোথায় পেলে এ কথা?

—একখানা ইংরেজী বইয়ে পড়লাম। একটি যুবক আর একটি যুবতী ই সর্ত্তে বিয়ে করেছিল; স্ত্রীটি ছিল নর্ত্তকী। নৃত্যকলায় চরমোৎকর্ষ

দেখানোই ছিল তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, সব-কিছুকে বলি দিয়ে ; কিন্তু জয় মাল্য পেতে হলে সবুব স'য়ে থাক্‌তে হয়....ছেলেটি তা'কে ততদিন প্রতিপালন কর্‌তে রাজী হ'ল—দু'জনাই ঐ কলা নিয়ে উন্মত্ত....

—তারপর ?

—খেয়ালের ঝোঁকে কিছুদিন বেশ চলল' ; ছেলেটি কাছে ঘেষে না—চুম্বন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ....কিন্তু ক্রমশঃ ছেলেটির সম্বন্ধে দেখা গেল, রক্ত বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌ছে—হৃদ্‌পিণ্ডে আঘাত কবছে—বললে, আমরা ভুল করেছি ; তুমি এস....

মেয়েটি বললে, উঁ হুঁ—আমি আর্টের উপাসিকা ; তোমাকে আমি ভালবাসি ; কিন্তু সাবধান, তুমি আমার সম্মুখে এস না—তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল—দুর্ব্বল পুরুষকে আমি ঘৃণা করি—তুমি যাও....

ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে পেলে—

কিন্তু একদিন হ'ল কি....

—কি হ'ল ?—অতুল সাগ্রহে জানিতে চাহিল।

—সেদিন জ্যোৎস্না রাত। স্বামী বাগানে বসে' ছিল, অন্ধকার একটা জায়গায়। স্ত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে—মিহি ঢিলে একটা আঙরাখায় দেহ আবৃত—বাহু তুলে' সে চাঁদের দিকে উর্দ্ধনেত্র হ'য়ে রইল....বাহু আন্দোলিত করে' কা'কে যেন সে আহ্বান করল'....

সে-আহ্বান যা'কেই করা হোক্ ছেলেটির মনে হ'ল, যেন তা'কেই—বাহু-সঙ্কেতে সে অন্তরঙ্গ পুরুষকেই আশ্লেষে আহ্বান করেছে—এতদিনে স্ত্রীর নারীত্ব দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে জেগেছে ; সে-আহ্বান আন্তরিকতায় এমনি গভীর আর উষ্ণ যে, ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসে দুর্ব্বার হ'য়ে ছুটে' এল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত সেই অপরূপ মূর্ত্তির কাছে আত্মার প্রথম বরণ সার্থক করতে....

কিন্তু তার আশা অমূলক—স্ত্রী তার কথা শুনে' অবাক্ হ'য়ে বললে, সে তাকে ডাকে নাই—জ্যোৎস্নালোকে স্ফুট স্ফূর্ত্ত জীবনকে সে অনাদি অনন্ত অমর জীবন-স্রোতে ঢেলে' দিয়েছিল। শুনে' ছেলেটি সাদা হ'য়ে গেল—কাঁপতে লাগল'....

বলিয়া শান্তি যেন ক্লান্ত হইয়া থামিল ; বলিল, আরো ঢের আছে—অতো বলতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না, বাবা।

অতুল একটু হতাশ হইল ; কিন্তু হাসিয়া বলিল, শেষটায় কি হ'ল ?

—যাকে দেখে, অর্থাৎ যার আকর্ষণে আর স্পর্শে মেয়েটির যৌবন উদ্বেল আর পূর্ণ সত্তা উন্মুখ হ'ল সেই পুরুষকেই সে আত্মসমর্পণ করল'....

—স্বামী ?

—সে বেশ্যাসক্ত হ'ল।... আচ্ছা, বাবা, যৌন-আকর্ষণ কি এমনি দুর্ব্বার !

অতুল শান্তির চোখে চোখে চাহিয়া বলিল, তা'-ই ত' মনে হয়।

—কিন্তু আমি ত' বোধ করিনে !

—সেই অর্থে উগ্র স্পর্শ তুমি পাও নাই। বলিয়া অতুল নিজের কথার তাৎপর্য্য ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল ; বলিল,—নারীর উপর পুরুষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই ; পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে, আর নিজেকে দান করে নিঃশেষ করে'। এটা হবেই ; সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করে' রেখেছে ঐ নিয়মটি....

অভয়া নিঃশব্দে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল—তার স্নায়ু আর মন পুনঃপুনঃ কেমন করিয়া মোচড় খাইতেছিল তা' সে-ই জানে। সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে যে-নিয়মটি তাহাকে পৌরাণিক কি আধুনিক উপাখ্যানের সাহায্যে অধিকতর

গুণোপেত করিয়া উপলব্ধি করানো যাইতে পারে। মনে হইতেই অভয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া একটু বেগের সঙ্গেই প্রবেশ করিল; নিয়মের ব্যাখ্যানকারীকেই সে বলিল,—তোমার কি একেবারেই মতিচ্ছন্ন ঘটেছে? এতদূর ক্ষেপেছ তুমি?

শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল ঈষৎ হাস্য করিল, অর্থাৎ দেখো তামাসা!

তা-ই বটে। শান্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, মা একেবারে ষোল আনা সেকেলে; পাঁজির মতো কেবল নিষেধে পরিপূর্ণ, আট-ঘাট বেঁধে দেওয়া।

—শাসন করে' সংযত রাখার উপায় ঐ। অতো অশুভ অন্যায় কথা আমি এখানে হ'তে দেব না।····তোমরা সম্পর্ক ভুলেছ এমন একটা মোহের বশে যা'কে ঘৃণা করতেও যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তা-ও যেন পারিনে।

শান্তি মায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিল; সুন্দর ভাষায় আর সুন্দরতর ভঙ্গীসহকারে বলিল,—মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে; যত গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টুমি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুণ। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করব' কেন? শিক্ষা নেব না?

নেও। বলিয়া অতুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভয়া চলিয়া গেল—ওদের নিষ্কৃতি দিল।

অতুলের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়; শরীর সুস্থ এবং পুষ্ট, কিন্তু শরীরকে অতিক্রম করিয়াই বিবেচ্য যে-কথাটা তা' এই যে, পিতৃসঞ্চিত

দেড় লক্ষ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ পাইয়া সে বড়লোক হইয়াছে। শিক্ষিতও সে খুব—বি-এ পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। এম্-এ পড়িবার সময় একটি ঘটনায় সে কলেজ এবং দেশ এক সঙ্গেই ত্যাগ করে।

শান্তিকে সে কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা দেয়; আবার শান্তিও তাকে শেখায়—এস্রাজ বাজানো শিখাইয়া লইয়াছে, এবং আরো শেখায়....

বলে, বাবা, তোমার হাত অতি চমৎকার, আমার চাইতেও ভালো, ভারি মিষ্টি। আমার কাছে শিখে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছাড়িয়ে যাও। মাস্টার মশায় সেদিন তোমার বাজনা শুনে' গেলেন ত'! আমাকে বললেন, শান্তি, তোমার বাবা একটি অদ্ভুত প্রতিভা; শিক্ষকের শিক্ষাকে এমন দ্রুত আয়ত্ত আর উন্নত করতে আর কাউকে দেখিনি।

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অতুল যথেষ্ট পুলকিত হইল; বলিল, কিন্তু তার একটা মানে আছে···

—মানেটা কি?

প্রচ্ছন্ন যে-জিনিসটা উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাকে নবজাতকের মরমী মর্য্যাদা দিতে শান্তি খুব প্রস্তুত; মানে জিজ্ঞাসা করিয়া সে উৎসুক হইয়া রহিল···

অতুল বলিল, তোর কাছে শিখতেই আমার কত আনন্দ! সেই মুখর আনন্দের আলাপ শুনে' মনে হয়, মধুর জিনিসকে মধুরতর করা হ'চ্ছে।....বলিয়া সে যেন চুরি করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল, তোর গুরুর কাছে শিখলে ওটা হ'ত না।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

অতুল তখনই কোন জবাব দিল না; একটু পরে, যেন একটা-কিছু সহিয়া লইয়া, বলিল,—সে অন্য কথা।

—অন্য কথা থাক্। কেমন সুন্দর মেঘ করেছে দেখ, বাবা!

অকালের মেঘ দেখে' আমার খুব নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। একটু বাজাবে, বাবা ?

অতুলও মেঘ দেখিল ; অপরাহ্নের সূর্য্যকে আবৃত করিয়া অত্যন্ত গাঢ় নীল পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—মেঘের অঙ্গ লাবণ্যময়, আর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে—মেঘের সেই গতিটুকু যেন তার কান্তিরই বিলসিত হিল্লোল—চক্রবালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে···

বলিল, বাজাবো। যন্তরটা দে।

শান্তি এসরাজ আনিয়া দিল ; বলিল, তুমি ততক্ষণ সুর বাঁধো, আমি সেজে আসি। বলিয়া সে এখনকার, অর্থাৎ মেঘলোকের সঙ্গে ভূলোকের মিলন-বার্ত্তা বহন করে যে-নাচ সেই নাচের, উপযুক্ত পোষাক পরিতে গেল, অবশ্য নাচের ভঙ্গীতেই গেল।

অতুল যন্ত্র বাঁধিল—

শান্তি সাজিয়া আসিল—অতি উজ্জ্বল চওড়া লাল পেড়ে' মেঘবর্ণের শাড়ী ঘাগরার মতো করিয়া সে পরিয়াছে, আর সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়াছে ঐ রঙেরই ওড়না ; ওড়নার জরির পা'ড় ঝক্‌মক্ করিতেছে ; গভীর কালো-চুলের রাশি বিস্তৃত করিয়া এলাইয়া দিয়াছে···সমগ্র কৃষ্ণ-পরিবেষ্টনীর মাঝে তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে—

দেখিয়া অতুল মুগ্ধ হইয়া গেল ; বলিল, বাঃ····

—মেঘ বিদ্যুৎ ঝড়। বলিয়া শান্তি হাসিল।

তার হাসিটাও হঠাৎ অত্যন্ত চমৎকার হইয়া দেখা দিল। পাদপীঠ রক্তাধরে প্রজাত হইয়া তার হাসি নিমিষেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—সুসজ্জিত শুভ্র দন্তপংক্তি যেন তার যৌবনবাহিত অন্তরের অপরূপ উদয়-ছটায় আলোকিত হইতে থাকে—সমগ্র মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়া যায়····

কিন্তু এখন তা' দেখা দিল আরো সুন্দর হইয়া—গৃহের অভ্যন্তরের

এই শ্যামসুন্দর মেঘম্লানিমা উত্তীর্ণ হইয়া মেঘের নীলাঞ্জন-অঙ্গে যেন তার হাসির ঝলক্ লাগিল—

অতুল মনে মনে তার তারিফ করিল; বলিল, সেজে' ত' এলে চমৎকার। কি বাজাবো?

শান্তি ভ্রূভঙ্গী করিল; বলিল,—তুমি যেন দিন-দিন নাবালক হচ্ছ, বাবা!

এই ভৎর্সনায় অতুলের আনন্দ দেখা দিল; যেন কৃতার্থ হইয়া বলিল, তা' আমি জানি; কিন্তু নাচবে যে তুমি! তোমার মন এখন কি বলছে আর কি চাইছে তা' আমি কি জানি!

—জানো।

—আচ্ছা। বলিয়াই অতুলের যেন সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে প্রতীক্ষার আর আয়োজনের শেষ হইয়া গেল—শান্তির উদ্দীপ্ত দেহ-ভঙ্গীর মাঝেই সে একটা ছন্দ খুঁজিয়া পাইল····যন্ত্রের তারে তার একটিমাত্র আঘাতে শব্দ যেন আত্মার আবেগে কল্লোলিত হইয়া উঠিল—

তারপর তার বাজনা শুরু হইল····

শান্তি সর্ব্বাঙ্গ অপরূপ একটা প্রযত্নের সহিত সংযত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে ধীরে তার দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল···

নৃত্য শুরু হইল—বাহু দেহ চরণের গতি মর্ম্মময় রূপ গ্রহণ করিল····

কুমারী সে—কেহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই—সে কিছুই জানে না, কিছুই সে গ্রহণ করে না—প্রেম তার অজ্ঞাত····

তারপর, পুরুষ তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে—তার দেখা পাইয়াছে, কিন্তু পরিচয় পায় নাই—কুমারীর গহন অন্তর রহস্যে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ ····তারপর সে প্রেমাভিলাষিনী, কিন্তু ছলনাময়ী····

অতুলের হাতে যন্ত্র যেন সজীব হইয়া সঙ্গীত ধ্বনিত করিতে লাগিল····

শান্তি এইবার দেখাইবে, কুমারীর কল্পনার লাস্য আর কেলিপ্রবণতা তিরোহিত হইয়াছে—সে এখন মহিমময়ী—জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার প্রেমে সে এখন প্রদীপ্ত—সে তার আত্মার সহচরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে—সে এখন রাজ্ঞী অথচ পরিচারিকা, বিজয়িনী অথচ কোমলা, পূজারিণী অথচ উপাস্যা—রঙ্গিনী অথচ পরম পবিত্রা—পরবশার মতো চায় সবই, কিন্তু কাঁপিয়া সারা হয়; মন চায় আর না চাহিবার ভান করে আর ভয় পায়—তারপরই সহসা একসময় কূলভাঙা উদ্বেল প্রেমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে—পুরুষের আপন হয়....

তারপর আসিল স্থিতি, গতি গণ্ডির ভিতর—শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাহুতি....

ঐ ব্যঞ্জনাময় নৃত্য শেষ হইল—শান্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—

মেঘ কাটিয়া অস্তমান সূর্য্যের আভায় পশ্চিমের আকাশ তখন লাল—ঘরেও তা' প্রতিফলিত হইয়াছে....

কোলের উপর যন্ত্র নামাইয়া অতুল ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে তাকাইল...নূতন কিছু দেখিবে বলিয়া সে তাকায় নাই, কিন্তু দেখিল যা' তা' প্রায় নূতনই—শ্রমে উত্তেজনায় শান্তির মুখমণ্ডলে একটা রক্ত আভা ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে শিশিরকণার সঙ্গে তুলনীয় বিন্দু বিন্দু স্বচ্ছতম ঘর্ম্ম—

আর, নাচ শেষ হইলেও অতুলের মনে হইতে লাগিল, প্রেমের এই ব্যাখ্যা, ব্যঞ্জনা আর মূর্ত্তি একটা উজ্জ্বল কলেবর ধারণ করিয়া সেই চিরন্তন মানবের অন্তরবৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, যে-মানব প্রেমাকাঙ্ক্ষী, মেঘ ঘনাইলে যার বুকে পিপাসা আর নিঃশ্বাস সঞ্চিত হয়; বিদ্যুৎস্ফুরণে যার মনে হয়, মিলনাকুলা অভিসারিকা কেকাকূজিত বনভূমিতে পথরেখার সন্ধান করিতেছে—

অতুলের চোখের সামনে খেলিতে লাগিল, তখনকার সেই রক্তপ্রান্ত অশেষ মেঘপুঞ্জের অপরূপ বর্ণ, আর, নিশ্চলতার সঙ্গে তার অপরূপ দ্যুতি আর গতি....

শান্তির নৃত্যে তা' অব্যর্থ আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ঈষৎ অন্ধকার কক্ষটি ছিল যেন মেঘের স্পর্শানুভূতির আবেশে মধুময়, আর মোহময়—ঐ নীল শাড়ীর প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া সঞ্চালিত উড্ডীয়মান্ ওড়নায় মেঘের গতি তরঙ্গায়িত হইয়া দেখা দিয়াছিল—ওড়নার সোনালী পা'ড়ে ঝলকিত হইয়াছিল বিদ্যুতের সর্পিল তীক্ষ্ণ স্ফুরণ....

পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিমান, সম্ভোগ প্রভৃতি নৃত্যে ব্যঞ্জিত করিয়া, অর্থাৎ আপনারই আবহস্বরূপটিকে রসে প্রেমে রঞ্জিত আর প্রেমের রসে রভসে নিমজ্জিত করিয়া শান্তি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল—

তার মুখের রক্তাভার সঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু এবং ঐ দু'টির সঙ্গে তার সঘন নিঃশ্বাস-পতনও অতুল দেখিল, এবং দেখিয়া অতুলের অকস্মাৎ যা' মনে হইল, এমনি দৃশ্যের সমগ্র পরিবেশের অভ্যন্তরে তা' অস্বাভাবিক নয়, অন্ততঃ তার পক্ষে—এবং তারও পূর্ব্বে নৃত্যভঙ্গীতে প্রেমের যে-ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল তাহাও ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইল, আর, সকলে মিলিয়া অতুলের মনে পড়াইয়া দিল, নারীর সঙ্গে পুরুষের নিকটতম যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দেহ একবার হয় অগ্নিগর্ভ একবার হয় রোমাঞ্চিত সেই সম্বন্ধটি....

শান্তি তখন নিজেকেই অধ্যয়ন করিয়া সুখভরে মৃদু মৃদু হাসিতেছে—

জিজ্ঞাসা করিল, কেমন নাচলাম, বাবা ?

—চমৎকার। কিন্তু প্রেমের তুই কি জানিস্ যে এমন সুন্দর করে' ফুটিয়ে তুললি ?—অতুল ঐ সংবাদটি জানিতে চাহিল....

শান্তি বলিল, স্বপ্নে পেয়েছি। যাই, পোষাক বদলে' আসি !

অভয়া এতক্ষণ ভূমিশয্যায় পড়িয়া প্রাণান্তকর বিক্ষোভে কেবলি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে ; উহাদের, যারা বাজাইতেছে আর নাচিতেছে তাদের, কি ইহকাল পরকাল ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান কিছুই নাই! উৎসন্নে যাইবার পথে কি উহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটুও চৈতন্যের উদয় হয় না যে তারা ভদ্রলোক! নরকের ভয় নাই!....অভয়ার মনে হইতে লাগিল, সে বড় অসহায়, আর বড় দুঃখিনী। প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার মতো মনই তার নয়—সে তা পারে না! তার এই অক্ষমতা হয় তার আরো কষ্টের কারণ—সেই কষ্টেই সে আরো অবসন্ন হইয়া ওঠে। মনে হয় পাগল হইয়া যাইবে।

যন্ত্রসঙ্গীত এবং তার আনুষঙ্গিক নৃত্য, অথবা নৃত্য এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত, সমাপ্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে অভয়া ধীরে ধীরে উঠিল....দ্বিতলে গেল—পর্দ্দা সরাইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল—দেখিল যন্ত্রসঙ্গীতে যিনি নিপুণ তিনি কৌচে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন, আর, যিনি নৃত্যনিপুণা তিনি বসিয়া আছেন পালঙ্কে—

উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে ; মেয়ে বলিতেছে : বাংলা তিরিশে গগন খাস্তগীরের বাড়ীতে যে নৃত্যপ্রতিযোগিতা হবে তা'তে আমি এই নাচটা দেখা'ব, বাবা। আরো বারকতক রিহার্সেল দিতে হ'বে। তুমি বাজাবে, বাবা। তুমি বাজা'লে মেডেল আমি অনিবার্য্য পাবই—ওস্তাদজীও খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। মা এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া শাস্তি হাসিল।

অভয়া বলিল, ঠাট্টা হ'চ্ছে!—অতুলকে বলিল, তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা ছিল....

শাস্তি বলিয়া উঠিল, তোমার গোপনীয় কথা কিছুই নেই। আমি

রসাতলে যাচ্ছি, বাবা তার সহায়—এই নিয়ে বাবাকে তুমি বকবে। এই তোমার কথা! আমার সামনেই বলো।

মেয়েকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অতুলকেই অত্যন্ত বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অভয়া রাগের সহিত বলিল,—আমি এখনও তোমার অন্ন খাচ্ছি, এ-ই আমার সব দুঃখের বড় দুঃখ। বলিয়া সে ক্ষিপ্র হস্তে পর্দ্দা সরাইয়া ক্ষিপ্র পদে চলিয়া গেল—

কিন্তু অতুল কিছুমাত্র বিদ্ধ হইল না—

অভয়ার রোষ অকারণ এবং অসম্বদ্ধ মনে হইয়া সে উল্‌টোভাবে হাসিতে লাগিল।

রাত তখন আটটা—

পর্দ্দার উপর ছায়া পড়িতেই শান্তি চেঁচাইয়া উঠিল, কে ওখানে?

—আমি। বলিয়া অভয়া মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া গত্যন্তর অভাবে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তার মনে ছিল না যে, চাঁদ উঠিয়াছে, আর অতুলের পড়িবার ঘর পূর্ব্বদ্বারী।

শান্তি নাচে, এবং বড় বড় বইও পড়ে, অতুল যথাসাধ্য মর্ম্ম গ্রহণ করায়, কিন্তু শান্তির ভারি বাছবিচার; কারণ, কোনো একটা জিনিসকে বহুর ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়া তার অনমনীয় দুরন্ত গোঁড়া হওয়া আধুনিক সভ্যতার একটা সুলক্ষণ বলিয়া সে মনে করে....

সেকলে, থ্যাকারে আর এ্যাডিসনের ইংরেজি ভালো নয়, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ; সেক্সপীয়রের এত পাঠান্তর আর এত নিজস্বতা যে, বাঙালীর পক্ষে তা' বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব, ইহাও সে বলে; ইংরেজিতে অনুবাদ করা অন্যান্য দেশের বই পড়া কঠিন, কারণ, পুস্তকান্তর্গত নামগুলি দুরুচ্চার্য্য—কোনো প্রকারে কায়দা করিয়া বাগাইতে পারিলেও বেশিক্ষণ মনে থাকে না; আধুনিক লেখকগণ বেশি প্রগল্‌ভ আর

ধড়িবাজ, মাঝে মাঝে অত্যন্ত নগ্ন—এতটা প্রায়ই ভালো লাগে না; প্রবন্ধ কি ভ্রমণবৃত্তান্তও ভালো লাগে না—মনে হয়, কুস্থন বড় বেশি····

—তবে তুই চা'স্ কি? প্লেটোনিক্ লাভের বই?

—আমি চাই সরল আনন্দ। ডিকেন্স আমি খুব পড়ি।

অভয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সরল আনন্দের কথা শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—ভৎ'সনা নির্গত হইল; বলিল,—তোমাকে দেয়া হবে গরল—সেই আয়োজনই বুঝি হ'চ্ছে। বলিয়া সে অতুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—তার চোখের উপর চোখ পড়িল; বলিল,—মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো ত'?

—নষ্ট করতে চাই তা' তুমি জানলে কি করে'?

—তবে লাভের কথা ওঠে কেন? তুমি সরে' থাকো না কেন? ইচ্ছা করে সরে' থাকো না দেখে তা'-ই মনে হয়। তুমি গুরুজন; গুরুজনের সম্মান নষ্ট হ'চ্ছে, তা' না বোঝার ভান করো কেন!····আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা' ঘটেছে····

অত্যন্ত শান্ত স্বরে অতুল বলিল,—তুমি যাও এখন।

—যাই। কিন্তু আমি আর যন্ত্রণা সইতে পারছিনে, নিজেকে বইতে পারছিনে—এত ভয় আমি কোনো দিন পাইনি।

—ভয়ের কোনো কারণ নেই—

—আছে; তোমাকে আমি চিনি। বলিয়া অভয়া চলিয়া যাইতেছিল, শান্তি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল; বলিল,—তোমাদের কথা আমি বুঝলাম না কিছুই; কিন্তু মনে হ'চ্ছে, কথাটা দুঃখের—তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে বলে ভয় করছ। সেটা কি, মা? বাবার কি চরিত্রদোষ ছিল?

অভয়া বলিল, বলব একদিন।

অতুল এ-কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; নির্ব্বিকারভাবে বলিল, তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

—তা' জানিনে। বলিয়া অভয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—

এবং শান্তি হঠাৎ জানিতে চাহিল,—মা, আমরা কি এখানে নির্ব্বাসিত?

এই প্রশ্নে অতুল একটু যেন কৌতূহলী হইল; মুখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিল।

অভয়া কথা কহিল না—

অতুল বলিল, কেন বল তো'?

—আমি দেখি তা'-ই। কোনোদিন তোমাদের মুখে অপর কারো কথা শুনিনে – কারো চিঠি আসে না। আমার কি মামা মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা কেউ নেই?

—আছে....

—তবে?

—তারা আমাদের খোঁজ নেয় না, আমরাও তাদের খোঁজ নিইনে।

—কখ্খনো না?

—না।

—অপরাধ?

—অভয়া বলিল, অপরাধ ওঁরই—উনি তা' অস্বীকার করুন দেখি....

মুখ চোখ দেখিয়াই মনে হইল, অতুল যেন বিপন্ন হইয়াছে—মনে মনে ভারি ছট্‌ফট্ করিতেছে; নিষ্পলক চোখে সে কয়েক মুহূর্ত্ত অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন করুণা প্রার্থনা করিতেছে....

কিন্তু মুখে সে বলিল,—তুমি এখন কি পড়ছিলে?

জিজ্ঞাসা করা হইল অবশ্য শান্তিকেই; এবং শান্তিই বলিল, তুমি কথা চাপা দিচ্ছ, বাবা; আচ্ছা তা'-ই হোক্—অতীতকে আর কথা কইয়ে কাজ নেই। বলিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল,—পড়ছিলাম ডিকেন্স। ডিকেন্সের লেখায় আমি যেমন সরল আনন্দ পাই, অপর কারো লেখায় তা' পাইনে। কিন্তু মা এসে রসভঙ্গ করে দিলে। তুমি যাও, মা।

উভয়েরই কাছে অপ্রস্তুত হইয়া অতুল কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া রহিল—অভয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং বাহিরে আসিয়াই সে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না—অসহ্য অতীত উত্তরোত্তর অতিশয় উচ্চকণ্ঠ আর যন্ত্রণাকর হইয়া উঠিয়াছে।

—তাহাকে উদ্‌গিরণ না করিলেই নয়।

অভয়াকে যেন কণ্টকবনে বিচরণ করিতে হইতেছে—তাহাকে সেখানে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—অষ্টপ্রহর এমনি তার শশব্যস্ত হইয়া নিষ্কৃতির উপায় অন্বেষণ আর যন্ত্রণা। মেয়েটিকে কোন্ পথে লওয়া হইতেছে তা' সে নিঃসংশয়ে জানে না, কিন্তু লক্ষণ আর সম্ভব যা' তা' ভয়ঙ্কর—ভাবিতে গেলে আকণ্ঠ-শুষ্ক হইয়া উঠিতে হয়—হুঁশ থাকে না—বুকের স্পন্দন অচল হইয়া আসে।

শান্তি একদিন গল্প করিয়াছিল যে, সে আর তার বাবা রাস্তায় বেড়াইতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া গেল একটি ভদ্রলোক; কিন্তু নিরীহ সেই লোকটিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া তার বাবার পলায়ন করিবার সে কি চেষ্টা! তার বাবা যেন চোর—ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে....

অভয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে-লোকটা কি করল' ?

—চোখ বড় করে' বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল'। অনেকক্ষণ পরে যেতে যেতে পিছনে তাকিয়ে দেখি, সে দাঁড়িয়েই আছে, ঠিক সেখানেই, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

—মুখখানা কেমন ? ওঁর মতো দেখতে ?

—না, বাবার মতো নয়, তোমার মতো ত' নয়ই। কে, মা? চেনা মানুষ নিশ্চয়ই ; আর, তার কাছে বাবা লজ্জাকর গুরুতর অপরাধে অপরাধী, এ-ও নিশ্চয়। ব্যাপারটা কি ? তুমি নিশ্চয়ই জানো....

শান্তি রাগ করে নাই, ভয় পায় নাই, ব্যথিত হইয়াছিল।

কিন্তু অভয়া সে-কথার জবাব না দিয়া প্রাণপণে অনুমান করিতে গিয়াছিল, লোকটা কে, কোন বাড়ীর! তার শ্বশুর বাড়ীর না বাপের বাড়ীর!

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, খুব বুড়ো নাকি লোকটা ?

বিরক্ত হইয়া শান্তি বলিয়াছিল,—বুড়ো বই কি ; বয়স ঢের হয়েছে মনে হ'ল। আরো যদি বর্ণনা চাও, দিতে পারি। খুব ফরসা রং, লম্বা, মোটা নয় বেশি, তবে পাতলাও নয়। পেলে ? ভাল কথা, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই—টাকার মানুষ বলে' মনে হ'ল—টাক পড়ে' আসছে। তোমরা দিন দিন আমাকে বিষম করে' তুলছ, তা' জানো !

অত্যন্ত ক্লান্ত ম্লান চক্ষে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অভয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, লোকটা কে !

অতুলই দিয়াছিল সদুত্তর—

শান্তির প্রশ্নের জবাবে সে বলিয়াছিল, ঐ লোকটা তাদের চূড়ান্ত অপকারের চেষ্টা করিয়াছিল তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া—

—কখন ?

—যখন আমরা পৃথক হই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার ভিতরে তার আসার দরকারই ছিল না—আমরা কেউ তাকে ডাকিও নি; দাদাকে ওকালতি কুপরামর্শ দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতেই একদিন দিলাম কষে প্রহার। সেই থেকে লোকটা পরম শত্রু হয়ে আছে....

বলিয়া অতুল এমন উন্মুক্ত একটি উচ্চহাস্য ধ্বনিত করিয়াছিল যে, প্রহারের অপমান আর যন্ত্রণা লোকটা আজও যে ভুলিতে পারে নাই তাহা প্রচণ্ড অথচ নির্ম্মল একটি কৌতুকের বিষয়।

শান্তির মনে হইয়াছিল, ঘটনা সত্যই বুঝি তা'-ই; কিন্তু অভয়া এই জাজ্বল্যমান মিথ্যা উক্তির দরুণ নয়, যথার্থ ব্যাপার সন্দেহ করিয়া বিবেকদংশনে অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

অতুল শান্তিকে লইয়া সিনেমায় গিয়াছে। কিন্তু ফিরিতে বড়ো বিলম্ব করিতেছে। 'শো' শেষ হয় সাড়ে ন'টায়; কিন্তু এখনো তারা ফেরে নাই—রাত দশটা বাজে। এই বিলম্বেই অভয়া উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে; নিজেদের কারে গিয়াছে, তা'তেই ফিরিবে—আট-দশ মিনিটের বেশি লাগে না; তবু ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন! সিনেমায় যাইতেছি বলিয়া অন্য কোথাও যায় নাই ত'!....ত্রাসে অভয়ার মাথার ঠিক থাকিতেছে না—একটা অগ্নিদহে পড়িয়া তার চৈতন্য যেন ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে....ছটফট করিতে করিতে অভয়া যাইয়া দাঁড়াইল দরজায়—কিন্তু সেখান হইতে বড় রাস্তায় যে উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে একটি বাড়ীর গায়ে তারি খানিকটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। গলির দু'টি বাড়ী পার হইয়া গেলে তবেই সোজা রাস্তা পাওয়া যায়, এবং সেখানেই চলে যানবাহন প্রভৃতি....

অভয়া ফিরিয়া আসিল—জানালায় যাইয়া দাঁড়াইল—সেখান হইতেও দেখা গেল উর্দ্ধগামী আলোকপুঞ্জের আভায় উজ্জ্বল শূন্য খানিকটা—তার উপরে অন্ধকার—তার উপরে নক্ষত্র—অতুলের গাড়ী সে-পথে আসিবে না....

সরিয়া আসিয়া সে দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—দূরে একটা উচ্চ শব্দ হইতেছিল, যন্ত্রের গর্জ্জনের মতো—সেই শব্দের দিকেই যেন সে চোখ মেলিয়া রহিল....

তারপর যাইয়া সে শুইয়া পড়িল মাটিতেই।

রাত তখন সওয়া দশটা ; ওরা এখনো ফেরে নাই....

শুইয়া থাকিতে থাকিতে তার সর্ব্বাঙ্গ একবার নড়িয়া উঠিল—একটা অনুচ্চ আর্ত্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপরই সে উঠিল, অকারণেই রান্নাঘরে গেল—সেখান হইতে ফিরিয়া ছাদে উঠিল—কোনোদিকেই না তাকাইয়া নামিয়া আসিল—শান্তির পড়িবার ঘরে গেল—সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ গেল নিজের শোবার ঘরে—পাতা বিছানা টান মারিয়া উল্টাইয়া দিল—বসিয়া পড়িল....

তার মনে হইতে লাগিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে ; তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধতা, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্ব্বুদ্ধি, সবই তার পাপ ; কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সম্বিতকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে....

তখনই পাওয়া গেল সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ....

অভয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন অনিবার্য্য আর অপরিহার্য্য একটা শোচনীয় দৃশ্য তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, আর বুক পাতিয়া দুর্জ্জয় শোকের ঝঞ্ঝা গ্রহণ করিতে হইবে....

শান্তি হাসিতে হাসিতে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল; তার পশ্চাতে অতুল, তাহারও হাসিমুখ। শান্তি বলিল, মা হয়তো ভাবছিল, মটোর এ্যাক্সিডেণ্ট হ'য়ে আমরা হাসপাতালে চালান গেছি। তা'-ই ভাবছিলে না, মা?

অভয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—না, আমি তা' ভাবি নাই। এত দেরী হ'ল যে?

কৌতুকে পুলকে ছিটকাইয়া উঠিয়া শান্তি বলিতে লাগিল,—বাবার কি কাণ্ড! মটোর ফেরৎ দিয়ে বললে, চলো হেঁটে যাই। তারপর রাস্তায় আসতে আসতে বাবার বারবারই দাঁড়ানো শুরু হ'ল; ভিখিরীটা কেমন ভঙ্গী করে বেঁকে' চুরে' শুয়ে আছে, তা' দেখল দাঁড়িয়ে; চানাচুরওয়ালার সুর ভাঁজা আর বুলি শুনল' দাঁড়িয়ে; রেলিং-এ লট্‌কানো ছবি দেখল দাঁড়িয়ে; একটা শতছিন্ন কাপড়-পরা মেয়েমানুষ বসে আছে পা ছড়িয়ে—একটা উলঙ্গ ছেলে আছে তার পিঠের উপর উপুড় হ'য়ে, তা' দেখল দাঁড়িয়ে! ইত্যাদি।....ইস্, এগারোটা বাজে যে!

—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে; শেখানো কথা—উনি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বলতে। তুমি পাষাণ, পাষণ্ড।

অত্যন্ত ঝাঁজালো সুরে শান্তিকে অবিশ্বাস করিয়া আর অতুলকে গালি দিয়া অভয়া প্রস্থান করিল।

—মা বলতে চায় কি! হঠাৎ ক্ষেপে গেল না কি! বাবা তোমাকে কেন মা গাল দিয়ে গেল?—শান্তি বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

—ঈশ্বর জানেন। চিরকালই দেখে আসছি, মাঝে মাঝে অমনি আবোল তাবোল বকে। বলিয়া অতুল নির্লিপ্তের মতো ধীরে ধীরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেল।

খাইতে বসিয়া 'মাধুকরী' ফিল্মের উপাখ্যানভাগের আলোচনাই চলিতে লাগিল ; শান্তি বলিল, বাবা, মা যদি দেখে তবে কি বলবে ! মূর্চ্ছা যাবে হয়তো। সন্তানের উদরান্নের জন্য নানা পুরুষের পরিচর্য্যা করা—অথচ কায়মনে যথার্থ সতী। উঃ, মা তা' ভাবতেই পারে না। বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

অতুল কেবল বলিল, হুঁ।

—কিন্তু ধন্য নরেন্দ্র—সেই মেয়েটিকেই ভালবেসে বিয়ে করলে ! ঐ জায়গাটায় কি রকম হাততালি পড়ল' ! তুমিও ত' হাততালি দিয়েছিলে বাবা।

—না, আমি দিইনি'।

—দিয়েছিলে।

অতুল আবারও অস্বীকার করিল,—না, আমি দিইনি।

ক্ষিপ্র একটা মেজাজের উপর অভয়া বলিয়া উঠিল, তুমি নিশ্চয় দিয়েছিলে—তাইতেই ত' এত রাত হ'ল।

তোমার চরিত্র চিরকাল কু।

শান্তি বুঝিল, মা উত্তেজনাবশতঃই অসংলগ্ন কথা বলিয়াছে ; সে বিহ্বলের মতো একবার তার বাপের মুখের দিকে, একবার তার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল ; দেখিল, তার বাবা নির্ব্বিকার চিত্তে আহারে ব্যাপৃত ; মায়ের চোখে প্রচুর জল আসিয়াছে। বলিল, ব্যাপার কি তোমাদের ! মা, তোমাকেই আমি দোষ দিই। বাবার চরিত্র কু হ'লেও সে-ইঙ্গিত বারবার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ ! আমাকে জানানো উচিত নয়।

—তোকে ও কুসংসর্গ দিচ্ছে—কেন বলব' না ! পড়ায় তোকে কদর্য্য বই, নাচায়, কথা কয় খারাপ খারাপ—আমি চুপ করে' থাকব ?

কিন্তু তারপরই তিনজনই চুপ করিয়া রহিল—আনন্দের আকাশ যেন দূষিত বাষ্পে ঘোলা হইয়া গেল—এই নিরানন্দ আবহাওয়া শান্তিকেই আঘাত আর বিব্রত করিল বেশি।

রাত্রি তখন অনেক—

অভয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—মেয়ের ঘরের দরজায় গেল—চৌকাটে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল--

তিনটি শয়ন কক্ষ পাশাপাশি—ভিতরের দরজা খোলাই থাকে, অর্থাৎ অর্গলে আবদ্ধ থাকে না। অভয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিল, শান্তির শয্যায় যাইয়া বসিল—তাহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতে লাগিল—শান্তির অগভীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; বলিল, কে ?

—আমি তোর মা। উঠে আয়, কথা আছে।

কথা যে আছে তাহা শান্তি বুঝিয়াছে—শুইয়া শুইয়া সে আজ অনেক কথাই ভাবিয়াছে। তার বাবাকে তাহারই সমক্ষে চরিত্রহীনতার অপরাধে পুনঃপুনঃ লাঞ্ছিত করার কারণ গভীরই ; নিরীহ ভদ্রলোককে পথে দেখিয়া তার বাবার চোরের মতন দ্রুতগতি পলায়ন করিবার কারণও গভীর—কেবল পারিবারিক কারণে বিবাদ নয়।

বাপের কুশিক্ষায় আর প্রশ্রয়ে সে অধঃপাতে যাইতেছে, মায়ের এই ধারণা—মায়ের উদ্বেগ স্বাভাবিক, কিন্তু মা গোপনে লক্ষ্য রাখিতে সচেষ্ট কেন !....তার বাবা অবশ্য তাহাকে কুশিক্ষা কিছুই দিতেছেন না—যে-সব কথাবার্ত্তা তাঁর সঙ্গে হয় তা' এখন সর্ব্বদেশেই সর্ব্বজনীনভাবে আলোচিত হইতেছে—মায়ের সেকেলে মনে আর শ্লীলতাবোধে তা' আঘাত করিলেও মা খুব প্রকাশ্যে তাহাকেই শাসন কি সাবধান করে

না—মায়ের যতো আক্রোশ বাবার প্রতি—যতো ভৎর্সনা তাঁকেই—আর, এমন কি হইয়াছে যে কাঁদিতে হইবে! মা খুব কাঁদেও।

শান্তির ইহাও মনে হইল, আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা জীবনে কেউ একবারও দেখা করিতে আসিল না কেন! সে দুষ্কৃতিটা কি যাহার দরুণ সবাই দূরে সরিয়া আছে একেবারে চিরদিনের মতো!

ইত্যাদি বিষয় এবং বিষয়ান্তরও পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া শান্তি ব্যাপারের হেতু এবং পরিণাম অনুমান করিতে পারে নাই—অপরাধ কোন্ জাতীয় তাহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই; এবং ইহাও তাহার স্মরণ হইয়াছে যে, তার বাবার মুখে কোনদিন পাপের কুণ্ঠা সে লক্ষ্য করে নাই—

না ঘুমাইয়া শান্তি ঐ সব যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছে, এবং বিস্মিত হইয়াছে····

তার মা একটা বেদনার দুর্গতির ভিতর দিয়া দিনাতিপাত করিতেছে ইহা যেমন সত্য, তাহাদের জীবন রহস্যাবৃত তাহাও তেমনি সত্য···

মা ডাকিতেই তাড়াতাড়ি সে উঠিল—বলিল, চলো শুনিগে।

উভয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠিল, এবং উঠিয়াই অভয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—চরম ব্যাকুলতার সহিত মেয়েকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া যে-কথা সে জানিতে চাহিল সে-কথা কেহ যে উচ্চারণ করিতে পারে তাহা বিশ্বাস হয় না—

অভয়া বলিল, আমি পাগল হ'য়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি ত'?

এ-প্রশ্ন মানুষকে কেবল অবাক নয় পাণ্ডুর করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট; শান্তি পাণ্ডুর হইয়া উঠিল; প্রশ্নের মর্ম্ম সে বুঝিল; মায়ের

স্পর্শ ত্যাগ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, নষ্ট করার মানে কি? আর 'ও' বলে তুমি কার কথা বলছ?

—বেটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিস্‌নে?

—বুঝলাম। কিন্তু 'ও' মানে কে?

—অতুল।

শুনিয়া শান্তি যেন বুকে ঘা খাইয়া নড়িয়া উঠিল আর সরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, বাবার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। ও ইচ্ছে করলে যে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।

—তুমি সত্যিই ক্ষেপে গেছ, মা—একেবারে উন্মাদ হয়েছ। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরলো কি করে! বাবা চরিত্রহীন, এ-কথা তুমি অনেকবার বলেছ; কিন্তু এ কি কথা তোমার মুখে! বাবা—

বাধা দিয়া অভয়া বলিল,—ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে কোলে নিয়ে ও-র সঙ্গে আমি কুলত্যাগ করেছিলাম....

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে নিঃশব্দ হইয়া গেল—

শান্তির একটা নিঃশ্বাস পতনের শব্দ হইল—তারপর চরম নিঃশব্দে একটি একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত্ত কাটিতে লাগিল।

ভয়ার্ত ত্রিপুরারি

ত্রিপুরারি গুপ্ত কিছুদিন হইতে বাতে কষ্ট পাইতেছেন। বাত আক্রমণ করিয়াছে তাঁর হাঁটু। ত্রিপুরারি বিছানায় পড়িয়া থাকেন, আর তাঁর মনে হয়, গতির অঙ্গে এই ব্যথা আর স্ফীতি না হইয়া কনুইতে হইলে এত কষ্ট হইত না। চলিতে না পারা বড় কষ্ট।

শারীরিক এই কষ্টের উপর ত্রিপুরারি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিতেছেন মনে। তাঁর সোদরোপম বন্ধু নীলমণি দত্ত অত্যন্ত অসুস্থ আর উত্থানশক্তিহীন হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহাকে দেখিবার জন্য ত্রিপুরারির মন ভারি ছট্‌ফট্ করে···মনে হয়, এমনি অবস্থায় আর কিছু দিন গেলে নীলমণির সঙ্গে বোধ হয় আর দেখাই হইবে না; নীলমণি চলিয়া যাইবে।

ত্রিপুরারির চিকিৎসা অবশ্যই চলিতেছে···

ডাক্তার বাতাক্রান্ত স্থানে মালিশের ঔষধ দিয়াছেন; এবং বাতের সঙ্গে শরীরে জ্বরেরও একটু উত্তাপ থাকায় কয়েক দাগ সেবনের ঔষধও দিয়াছেন। কিন্তু ত্রিপুরারির বেজায় জিদ্, জ্বরের ঔষধ তিনি কিছুতেই সেবন করিবেন না—

বলেন, ব্যথা গেলে জ্বর আপনি যাবে।

তাঁর এই একগুঁয়েমির বাধা দিয়াছেন সবাই। কিন্তু ফল হইয়াছে সামান্যই। তবে সুখের বিষয়, মালিশে ফল দেখা যাইতেছে—হাঁটুর ফুলা এবং ব্যথা ইদানিং অনেকটা কম মনে হইতেছে; কিন্তু এখনও তাঁর ওঠা হাঁটা বারণ, আর, একাদশী ও পূর্ণিমা অমাবস্যায় ভাত নিষিদ্ধ হইয়া আছে।

ত্রিপুরারির বয়স প্রায় ষাট।

বলা চলে যে, ত্রিপুরারির সংসার সুখের সংসার। ত্রিপুরারি সামান্য কিছু পেন্‌সন পান, কিন্তু তা' না পাইলেও সংসারের ক্ষতি হইত না— স্বতন্ত্র আনুকূল্য হিসাবে ঐ ক'টি টাকা কেহ লক্ষ্যও করে না। তিনটি ছেলেই উপার্জ্জন করে—তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের ভিতর ত্রিপুরারির পেন্‌সনের টাকা, জলের সঙ্গে জলের মতো, সঙ্গে সঙ্গেই মিশিয়া যায়।

যে প্রাণান্ত পরিশ্রম তিনি কর্ম্মজীবনে করিয়াছেন, এবং যেরূপ আহত স্বাস্থ্য লইয়া তিনি শেষবারের মতো অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তার তুলনায়, অর্থাৎ পাওনার দিক্ দিয়া, তাঁর বেতনও ছিল সামান্যই, পেন্‌সনও পান সামান্যই—

তবু ত্রিপুরারির মনে স্ফূর্ত্তি আছে যে, তিনি স্বাধীন—তাঁর অন্ন বস্ত্রের বাবদ যে খরচ তাহা তিনি নিজেই বহন করিতেছেন। বাতে অক্ষম হাঁটুর অবলম্বন লাঠির মতন অন্যের উপর তিনি নির্ভর করিয়া নাই— আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নাই; তবে সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন আছে, এবং তাহা তিনি পাইতেছেন; তাঁর হাঁটুতে ঔষধ মালিশ করিবার, শরীরের উত্তাপ বাড়িল কি না তাহা গায়ে কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিবার, পায়ের তলা জ্বালা করিলে হাত বুলাইয়া দিবার, এবং হাওয়া করিবার লোকের অভাব নাই....

এবং ত্রিপুরারি জানেন যে, নীলমণি দত্তেরও ঐসব করিবার লোকের অভাব নাই। নীলমণির স্ত্রী আছে, একটি বিধবা কন্যা এবং একটি বিধবা পুত্রবধূ আছে, পুত্রেরা আছে, আরো পুত্রবধূ আছে, এবং আরো কন্যা আছে।

ত্রিপুরারি নীলমণির খবর পাইতেছেন: আমাতিসার আর শ্লেষ্মার

দোষ প্রশমিত হইয়াছে; তাঁর পাকাশয় আর মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল; তবে ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই।"

শুনিয়া ত্রিপুরারি আশ্বস্ত হইতে পারেন না। আমাতিসার আর শ্লেষ্মা উভয়ই অত্যন্ত খল—কখন্ হঠাৎ প্রবল হইয়া একেবারে অসাধ্য সঙ্কটের সৃষ্টি করে তার কিছুই ঠিক্ নাই....

ইহাও একটি দুস্তর ভীতি—

দ্বিতীয়তঃ, লোকের মুখে রোগীর, এবং রোগের, হ্রাসবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া এবং নিজের চোখে রোগীকে দেখা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা, এ-দু'টিতে অনেক তফাৎ।

ত্রিপুরারির ক্ষোভের অন্ত নাই।

আজ দু'দিন দেখা যাইতেছে যে, ত্রিপুরারির হাঁটুর ব্যথা অনেক কম, এমন কি, নাই বলিলেই চলে। তবে সম্মুখেই অমাবস্যা, রস বৃদ্ধির সময়; তখন ব্যথা বাড়ে কি না দেখিতে হইবে—ডাক্তারও তাহাই বলিয়াছেন।

প্রতিবাদের ভয়ে অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে সেদিন বৈকালে ত্রিপুরারি প্রস্তাবপূর্ব্বক বলিয়া বসিলেন যে, নীলমণিকে তিনি একবার দেখিতে যাইবেন....

শুনিয়াই সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—

স্ত্রী বিরাজমোহিনী বলিলেন,—তোমার নীলমণি ভালই আছে। ভয় কেন এত?

ছেলেরা বলিল,—আমরা প্রায়ই খোঁজখবর নিচ্ছি, যাওয়া আসা

করছি, ডাক্তারকেও জিজ্ঞাসা করেছি ; তিনি বলেছেন, শীগ্‌গিরই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

মেয়েরা এবং বধূরা বলিল,—একটু ব্যথা কম্‌তেই আপনি অত্যাচার কর্‌বেন না, বাবা।

বিরাজমোহিনী পুনরায় বলিলেন,—নিজেও ভুগবে, বাড়ির লোককেও ভোগাবে....

প্রতিবাদের তেজ দেখিয়া ত্রিপুরারি তখনকার মতো নিরস্ত হইলেন। কিন্তু ভারি কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন।

নীলমণিদের সঙ্গে এঁদের একাত্মতা চলিয়া আসিতেছে প্রপিতামহের সময় হইতে। তখনকার ঘনিষ্ঠতা ছিল কেবল বন্ধুত্বের। কিন্তু নীলমণির পিতার আমলে এই ঘনিষ্ঠতা ভ্রাতৃত্বে দাঁড়াইয়া গেল—শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া নীলমণি আসিল ত্রিপুরারির মায়ের ক্রোড়ে, তাঁর স্তন্যপান করিতে লাগিল ত্রিপুরারির মতই।...ত্রিপুরারির মা মারা গেলে ত্রিপুরারির অশৌচান্তকাল পর্য্যন্ত নীলমণি বাড়িতে মাছ আনিতে দিলেন না—শ্রাদ্ধে টাকা দিলেন ; বলিলেন,—মাতৃশ্রাদ্ধে সকল ভাই-ই টাকা দেবে, এই-ই শাস্ত্রীয় বিধি।

ত্রিপুরারি শাস্ত্র জানেন না, কিন্তু নীলমণির মন জানেন—বিনা আপত্তিতে এবং বিনা দ্বিধায় নীলমণির টাকা লইয়া তিনি শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্যয় করিলেন।

ঐ সব কথা ত্রিপুরারির বাড়ীর সকলেই জানে, এবং ইহাও জানে যে, নীলমণির বাড়ীর কাহারো সঙ্গে এ-বাড়ীর কাহারো কলহ ভয়ঙ্কর নিষিদ্ধ কাজ।

পরদিন বৈকালে ত্রিপুরারি একেবারে প্রস্তুত হইয়া, এমন কি রওনা হইয়াই, বলিলেন, আমি নীলমণিকে দেখ্‌তে চল্‌লাম। বলিয়াই চলিতে শুরু করিলেন; কাহারো নিষেধ, এবং অনর্থক বলিয়া রিক্‌শ ডাকিবার প্রস্তাবে, কর্ণপাত করিলেন না—তবে মোটা একখানা লাঠি হাতে লইলেন।

নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িলেও কিছুদূর যাইয়াই ত্রিপুরারির অনুতাপ জন্মিল—রিক্‌শয় আসিলেই ভাল হইত—জানুগ্রন্থিতে বেদনা সঞ্চার হইয়াছে—লাঠির উপর বেশি করিয়া ভর দিতে হইল···

পথে ভক্তিভাজন পণ্ডিত চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর সঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক একটু আলাপ করিতে দাঁড়াইয়াই তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—ব্যথার স্থান টন্‌ টন্‌ করিতে লাগিল····

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইয়া ত্রিপুরারি নীলমণির বাহির দরজায় পৌঁছিলেন—তাঁর ডাক শুনিয়া নীলমণির ছোট ছেলে শৈলপতি দৌড়াইয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

ত্রিপুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর বাবা কেমন আছে রে?

—সেই রকমই। বলিয়া শৈলপতি তাঁহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল,—আসুন জ্যাঠামশায়, ভেতরে আসুন। বাবাকে দেখ্‌বেন আসুন। বাবা রোজই আপনার খবর জিজ্ঞাসা করেন।

—চল্‌ যাই।

ত্রিপুরারি ভিতরে আসিলেন—

একটি মেয়ে বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়াইয়া বেণী-রচনা করিতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া সে লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেল; ত্রিপুরারি আর কাহাকেও

দেখিতে পাইলেন না। শৈলপতির পিছন পিছন তিনি নীলমণির শয়নকক্ষের দরজায় আসিলেন, এবং আসিয়াই একটা গন্ধ পাইলেন। গন্ধটাকে দুর্গন্ধ বলা যাইতে পারে।

নীলমণি ত্রিপুরারির আগমন জানিতে পারিয়াছেন—দরজার দিকেই তিনি তাকাইয়া ছিলেন; ত্রিপুরারি প্রবেশ করিতেই তাঁহাকে দেখিয়া নীলমণির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন, এখনো খোঁড়াচ্ছ যে? সারে নি'?

—না সারার কথাও নয়।

—নীলমণি বলিলেন, এসো।

শৈলপতি চেয়ার আগাইয়া দিল—ত্রিপুরারি লাঠি রাখিয়া বসিলেন····

নীলমণি বলিলেন, আর আশা নেই, ভাই; কিন্তু ভয়ও নেই; ইচ্ছেও নেই যে, আর থাকি। এ-অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচি। বড়ো যন্ত্রণা পাচ্ছি।

—যন্ত্রণা কিসের?

—এই পড়ে' থাকার। ডাক্তার কি কেউ স্পষ্ট করে' আমাকে কিছু বল্‌ছে না; কিন্তু আমি জানি, আমার শরীরের রস একেবারে শুকিয়ে গেছে। দেখ্‌বে?

—কি দেখ্‌ব'?

—দেখ।····শৈল, আমার গায়ের কাপড়টা নামিয়ে দে ত' কোমর পর্য্যন্ত····

শৈল তাহা দিল—

ত্রিপুরারি নীলমণির গা দেখিলেন, এবং নীলমণি বলিলেন, দেখ পেট কোথায় নেমে গেছে—পেটে পিঠে এক। বুকের আর পাঁজরার হাড় দেখ; হাড়ের উপর চামড়া কেবল, মাংস নেই।

ত্রিপুরারি তা' দেখিলেন, এবং নীলমণির কঙ্কালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর এমন হয়েছে, আমাকে কেউ ত' তা' বলেনি' !

—আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম। শৈল, আমার বালিশটা উল্টে' দে ত'—মাথার নীচে বড়ো গরম হ'য়ে গেছে....

ত্রিপুরারি শৈলপতির মুখের দিকে তাকাইলেন; দেখিলেন, বাপের দেহের দিকে সে ভীত চক্ষে তাকাইয়া আছে।

শৈলপতি বাপের গায়ের চাদর আবার গলা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া এক-হাতে বাপের মাথা তুলিয়া ধরিয়া অন্য হাতে বালিশ উল্টাইয়া দিল—দিল বটে, কিন্তু যেন আল্‌গোছে।

ত্রিপুরারি অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; এবং আরো দেখিলেন যে, নীলমণি যে শয্যায় শুইয়া আছেন তাহাকে পরিচ্ছন্ন বলা চলে না। এই ঘরের দুয়ারে আসিতেই যে গন্ধটা তাঁর নাকে গিয়াছিল, এবং এখনও যাইতেছে, নীলমণির প্রতি সূক্ষ্ম সযত্ন দৃষ্টির অভাবেই তা' জন্মিয়াছে বলিয়া ত্রিপুরারির মনে হইল....

বলিলেন, শৈল, তোর বাবার বিছানাটা একটু পুরু আর পরিষ্কার ক'রে দিস্। হাড় ত' কেবল! চিম্‌ড়ে' তোশক বড় শক্ত লাগ্‌ছে মনে হয়।

শৈল বলিল, দেব।

—এতদিন দে'য়া হয়নি কেন?

শৈল কথা কহিল না—নীলমণি একটু হাসিলেন; বলিলেন,—শৈল, যা এখন। আমি ত্রিপুরের সঙ্গে একটু গল্প করি।

শৈল বলিল, কথা বেশি বলবেন না, বাবা।

—না।

শৈল চলিয়া গেল।

নীলমণি বলিলেন, তোমার হাত আমার হাতের ওপর রাখো।....
তোমার হাত বেশ গরম—ভালো লাগছে।....কত আর করবে ওরা
বলো! আমাকে টেনে' টেনে' ওরা যথার্থই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

শরীরের, কাজেই মনেরও, এম্‌নি অবস্থায় অল্পতেই ত্রুটি ধরা এবং
ভুল বুঝিয়া অভিমান করা স্বাভাবিক—ত্রিপুরারি তাই প্রতিবাদ
করিলেন; বলিলেন, না, না....

—হ্যাঁ, ভাই। মনে হয়, আমার কাছ থেকে যেতে পারলে বাঁচে।
আমার বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ কাছে খানিক্ বস্‌তে চায় না।
আমি নিন্দে করে বলছিনে—ওটা স্বাভাবিক। জীবিতের সঙ্গে জীবন্মৃত
খাপ খায় না। আমার দিকে তাকিয়ে ওরা ভয় পাচ্ছে, কষ্টও পাচ্ছে।
ভয় যে দেখায় আর কষ্ট যে দেয় তাকে মানুষ বেশিক্ষণ সহ্য করবে কেমন
করে!

ত্রিপুরারি নীলমণির কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,
তা' যদি সত্য হয় তবে দুর্দ্দিন বটে, আর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

নীলমণি বলিলেন, হ্যাঁ, এখন গেলেই বাঁচি। বড়ো কষ্ট।

বন্ধুর প্রতি ত্রিপুরারির অনুকম্পার সীমা রহিল না; কিন্তু ত্রিপুরারিও
তখন বড় কষ্ট পাইতেছেন—হাঁটুটা বড়ই টন্ টন্ করিতেছে; মনে হইল,
যেন দ্রুতবেগে ফুলিয়া উঠিতেছে—কাপড়ের উপর দিয়াই হাত ছোঁয়াইয়া
দেখিলেন, স্থানটা গরম, কিন্তু ফোলে নাই।....তারপরই তাঁর মনে হইল,
হাঁটুর নীচে হইতে গোড়ালি পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানটা যেন ঝিন্ ঝিন্
করিতেছে....

বলিলেন, আমি এখন উঠি, ভাই। বাতের যন্ত্রণাটা বড় জানাচ্ছে।
আমাকে না জানিয়ে যেন যেও না।

উভয়েরই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—

নীলমণি বলিলেন, বাতের কি চিকিৎসা করাচ্ছ ?

—মালিশের ওষুধ দিয়েছে—ওষুধ খাচ্ছিও। ....আমি ওদের বলে' যাচ্ছি, যেন তোমাকে উচিত মতো দেখে শোনে।

নীলমণি খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, না, না, খবরদার না। ওরা মনে আঘাত পাবে, হয়তো রাগ করবে ; ওদের মন স্বাভাবিক পথেই চলেছে ; আমার যে অভিমান নেই তা' ওরা বুঝবে না ; মনে করবে, লাগিয়েছি।

—তা' হলে বলব না। বলিয়া ত্রিপুরারি উঠিলেন—

বিদায় লইবার সময় বলিলেন, —ব্যথাটা না থাকলে কাল কি পরশু আবার আসব। তোমার ধৈর্য্য ধারণ করে' অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।

নীলমণি একটু হাসিলেন—

বলিলেন, হুঁ।

ত্রিপুরারি রিক্শয় চাপিয়া, এবং 'নিদান'কালের দুঃসহ অসহায় অবস্থাটা অতিশয় তীব্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী আসিলেন ; এবং আসিয়াই শয্যাগ্রহণ করিলেন, কেবল বাতের যন্ত্রণায় নহে, দুর্ব্বল দেহ ঐটুকু নাড়া পাইয়াই যেন ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে....

বলিলেন, আমি যে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি তা' বুঝতে পারিনি।

"হয়েছ, তা' আমরা বুঝতে পেরেছি ; আর, তোমার তা মনে থাকে না। জলের গ্লাসটা ধরে' থাকতে তোমার হাত কাঁপে। তবু যাওয়া চাই-ই।" বলিয়া স্ত্রী বিরাজমোহিনী স্বামীর বন্ধুসন্দর্শনে যাওয়ায় যে অবুঝপনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করিলেন।

ছেলেমেয়েরা এবং পুত্রবধূরাও অসুস্থ ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া তাঁহাকে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকিতেই অনুরোধ করিল।

স্ত্রী বিরাজমোহিনীর মতামত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার অধিকতর; তিনি পুনরায় বলিলেন, —শুধু শুধু হুজুগ করে' সবাইকে এমন করে' ব্যস্ত করা কেন!

কিন্তু ত্রিপুরারি ঐ সব বিরুদ্ধ কথার জবাব দিলেন না; বলিলেন, কেমন একটা গন্ধ নাকে গেল...

—কোথায়?

—নীলমণির ঘরে। গন্ধটা নাকে যেন লেগেই আছে....

বিরাজ বলিলেন, ঐ গন্ধের জন্যই ত' বাড়ীর লোকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছে।

—গন্ধটা কিসের?

—বোধ হয় রোগীর বিছানার, গয়ের আর শ্লেষ্মা প্রভৃতির।

শুনিয়া নিজেরই রোগাক্রান্ত দেহের উপর ত্রিপুরারির ভারি একটা ঘৃণা বিতৃষ্ণা অরুচি জন্মিয়া গেল—সমস্ত শরীরটার দিকে একবার তাকাইলেন; মনে হইল, অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু শরীরের ভিতরে বাহিরে উৎপন্ন হইয়া তাঁর রস রক্ত অবিরাম শোষণ করিতেছে। ত্বক তাই এমন রুক্ষ শুষ্ক বিবর্ণ।

—কেউ মাথায় বাতাস করুক এসে। বলিয়া বিরাজমোহিনী চলিয়া গেলেন। কিন্তু বড় বউমা বাতাস করিতে আসিলে ত্রিপুরারি নিষেধ করিয়া তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

কথা এই যে, ত্রিপুরারির মনে অত্যন্ত আতঙ্ক জন্মিয়াছে....

নীলমণি বলিয়াছেন, শয্যাগত জীবন্মৃত ব্যক্তিকে স্বভাবের সহজ গতিতেই লোকে পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ হইয়া ওঠে ; স্বভাবের সহজ গতিকে নিরোধ করিবার উপায় নাই—কর্ত্তব্যবুদ্ধির কি কাহারো নির্দেশ মানুষ শুনে না। ইহা ঠিকই যে, জীবন্মৃত ব্যক্তি অবাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিতে বাধ্য—আনন্দের সে বিঘ্ন, আর, দলের বাহিরে। অশেষ অনুকম্পায় প্রাণ বিগলিত হইতে থাকিলেও যন্ত্রণাপ্রদ দৃশ্য সম্মুখে করিয়া লোকে কতদিন স্থির আর সুস্থ থাকিতে পারে! নীলমণি বুঝিয়াছে ঠিক।

হৃৎকম্প দেখা দিয়া ত্রিপুরারির মনে হইল, তাঁহারও অমনি দুর্গতির সেই দিন অতিশয় দ্রুতগতি আগাইয়া আসিতেছে যেদিন তাঁহাকে কেহ চাহিবে না—শরীরে দুর্গন্ধ হইবে ; চরম সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আর যত্ন করিয়া তাঁহাকে অবিরাম রক্ষা করিয়া চলিতে চলিতে একদিন সবাই শিথিল অমনোযোগী হইয়া যাইবে—একজনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক অস্থির হইয়া থাকাই যে কত ক্লান্তিকর তাহা বুঝা যাইবে তখন...

বাঁ পা-খানা সময় সময় একেবারে অসাড় মনে হয় ; শরীরও শীর্ণ অসমর্থ হইয়া আসিতেছে।....অনভিলষিত অস্তিত্ব লইয়া কত কষ্ট যে তখন পাইতে হইবে, আর, লোককে কত অনিচ্ছুক আর বিরক্ত করিয়া তুলিতে হইবে তাহার কি ইয়ত্তা থাকিবে! নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় গল-গ্রহের মন হইবে অত্যন্ত অসহিষ্ণু, সর্ব্বক্ষণ অপরাধ গ্রহণে উদ্যত, এবং অনিচ্ছাকৃত অবহেলাও বুকে বাজিবে বিষাক্ত শেলের মতো...

অস্থির ঠেকিয়া ত্রিপুরারির গা ঘামিয়া উঠিল—

নীলমণি বলিয়াছে ঠিক্, নীলমণি ঠিক্ বুঝিয়াছে—

নীলমণির নামের সঙ্গে ঐ দু'টি শব্দ মস্তিষ্কে আবর্ত্তিত হইতে হইতে চরম একটা বিষাদ আর বিভীষিকার মাঝে ত্রিপুরারির কার্য্যাকার্য্যের জ্ঞান হঠাৎ

লুপ্ত হইয়া গেল—তিনি উঠিয়া বসিলেন—টেবিলের দিকে তাকাইলেন—চোখে পড়িল, একটা শিশির গায়ে লেবেল্ রহিয়াছে—লাল কাগজের উপর বড়বড় কালো অক্ষরে লেখা রহিয়াছে Poison—বিষ ; চট্ করিয়া শিশিটা তুলিয়া লইয়া মালিশের সমস্তটা ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া, আর, শিশিটা টেবিলের উপরেই নামাইয়া দিয়া ত্রিপুরারি আবার শুইয়া পড়িলেন—ধীরে ধীরে দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া কা'ত হইয়া রহিলেন....

আরোহণ ও অবরোহণ

যথোচিত চিন্তা করিয়া মহেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে প্রস্তাবিত কাজটি যদি করা যায় তবে তাহা অসমীচীন হয় না। মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং চিন্তা করিয়াছেন—উপরন্তু তাঁর হিতৈষী বন্ধুগণও ঠিক্ তাঁরই মত যথোচিত চিন্তা করিয়া প্রস্তাবিত কাজে দুর্লঙ্ঘ্য আপত্তির কারণ কিছুই দেখিতেছেন না।

একটিমাত্র আপত্তির কারণ যা আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহাই আপত্তিজনক এবং তাহা এই যে, প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে এক-ঘর কুটুম্ব কমিয়া যাইবে অর্থাৎ বাড়িলে বাড়িতে পারিত কিন্তু বাড়িবে না।

কিন্তু কুটুম্ব বাড়িবার কথায় একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দই উঠিল···

মহেন্দ্রনাথের বন্ধু দীনবন্ধু দত্ত বলিয়া উঠিলেন: ছোঃ! তারপর ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন এবং তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটির দৃষ্টি শাণিত করিয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক বলিলেন—কুটুম্ব বাড়িয়ে ত ঢের মজা হে! তিনটি কন্যা আর দুটি পুত্রের বিয়ে দিয়েছি—কুটুম্ব হয়েছে পাঁচ ঘর—শুন্‌তে ভারি মধুর, নয়? ঐ কুটুম্বদের আবার ডালপালা আছে—শাখা-পল্লবে ছত্রাকার হয়ে সংসারময় ছড়িয়ে তাঁরা আমার মাথার উপর বিরাজ করছেন। মাথায় আমার তাপ লাগ্‌বার উপায় নেই। সুখ কত!···· কুটুম্বের কেবল দাবি খাতির করো, আর যত পারো দাও আর খাওয়াও। বলিয়া দীনবন্ধু কুটুম্বিতা রক্ষার অর্থাৎ অন্যায় চাপের দরুণ একটি সশব্দ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সখারাম বলিলেন, ভারি একটা নিঃশ্বাসই ফেল্‌লে যে হে!

—তা ছাড়া আর উপায় কি! নিঃশ্বাসে যে শব্দ হয় তার বেশি শব্দ করতে পারিনে যে। না আছে কুটুম্বগণের মরণ, না আছে আমার মরণ।

দীনবন্ধুর এই কথায় হাসির শব্দ উত্থিত হইল।

দীনবন্ধুই পুনরায় বলিলেন, দিন-কাল যা দাঁড়িয়েছে, আর, পাওনার দিকে মানুষের যেমন চোখ ফুটেছে তাতে কুটুম্ব যতই কমে ততই সুখ।

কুটুম্বের সংখ্যাবৃদ্ধি যে নিছক্ আনন্দের কথা নয়, অতঃপর সবাই তা স্বীকার করিলেন।

কথাটা এই :

মহেন্দ্রনাথের দুটি কন্যা সতী এবং ঊষা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া একই সঙ্গে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। সতীর বয়স উনিশ, ঊষার বয়স সতের ; এবং মহিমগঞ্জের ইন্দ্রনাথবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জনের জন্য সতীকে দেখিতে আসিয়া ঊষাকেও পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন—দেখিবার আয়োজন করিয়া দেখেন নাই, তবু পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন ; পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁর দুটি পুত্রেরই বিবাহ একই সঙ্গে দিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছেন—পূর্ব্বে অভিলাষী ছিলেন না, মেয়ে দুটিকে দেখিবার পর অভিলাষী হইয়াছেন ; কারণ দুটি কন্যাই উত্তম, এমন কি অনুপম। মহেন্দ্রনাথের যদি অমত না থাকে তবে কথাবার্ত্তা চালানো যাইতে পারে এবং তদনন্তর যুগলবধূকে একত্রেই গৃহে আনয়ন করা যাইতে পারে....

এই পত্র পাওয়ার পরই কুটুম্বের সংখ্যা-হ্রাসের অর্থাৎ সামাজিক বৃদ্ধি হানির আপত্তি চাঞ্চল্যকর হইয়া উঠার উপক্রম হইয়াছিল ; মহেন্দ্রনাথ সামান্য দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কুটুম্বগণের কিংবা ন্যূনকল্পে স্বীয় মৃত্যুকামনা করার সঙ্গে সঙ্গে একটি শোকনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু সে আপত্তি আর দ্বিধা প্রায় ভস্মীভূত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন—দীনবন্ধু নেহাৎ মিছে বলে নাই।

তারপর আলোচনা আর হিসাব করিয়া দেখা গেল, কন্যার বিবাহের মত বৃহৎ ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সুলভে সম্পন্ন নিশ্চয়ই হয় যদি ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দুটিকেই একসঙ্গে, সখারাম বলিলেন, "পার করা যায়।"

ব্যয় হ্রাসের জায়-তফ্‌সিলও মুখে মুখেই খতাইয়া দেখা হইল :

প্রীতিভোজ, বরানুগামী ভদ্রমহোদয়গণের আপ্যায়ন, গৃহে আত্মীয়-সংগ্রহ প্রভৃতির খরচ দু'বার বহন করিতে হইবে না—

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—বিয়ে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন যারা আসে, বাপ্ রে তাদের খিদে কত !....যাক্, তারপর ?

তারপর, চেষ্টা করিলে পণ প্রভৃতি কিছু কমানো যাইবে না এমন নয় ; কারণ, একই ব্যক্তির নিকট হইতে দুই পাত্রের জন্য দ্বিগুণ আদায় না করিয়া ভদ্রলোক দেড়ামাগুলেই সন্তুষ্ট হইবেন আশা করা যায় ; কারণ চক্ষুলজ্জা সবারই কিছু আছে।

তারপর গার্হস্থ্য প্রীতি ও শান্তির উল্লেখ করিয়া তারাপদ বলিলেন, দুই ভগিনীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রণয়বন্ধন বিদ্যমান জা সম্পর্ক দাঁড়াইলে তাহা দৃঢ়তর হইবে—তাহা না হইলেও সহসা তা ছিন্ন হইবে না ; কারণ ঈর্ষার উদ্ভব হইলে উহারা সংবরণ করিবে, কর্ত্তৃত্ব লইয়া কলহ করিবে না এবং অপরিচিত ব্যক্তি নহে বলিয়াই সন্দেহের চক্ষে দেখিবে না ; পিতৃশাসনের ভয়েই ত্যাগ এবং আনুগত্য স্বীকারে কাহারও অনিচ্ছা প্রকাশ পাইবে না—ইত্যাদি।

তারপর বিবেচনার বিষয় হইল, পারিবারিক উত্থান-পতন। উহা আছেই। একই সঙ্গে দুই ভগিনীর উত্থান-পতন ঘটিবে ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে বিবাহ হইলে তাহা ঘটে না—নিজের নিজের অদৃষ্টই প্রবল হইয়া থাকে....

দীনবন্ধু বলিলেন, এ বিঘ্ন মারাত্মক নয়—দুই ভগিনী যদি সতীন হ'য়ে যায় তবে সেইটাই হয় ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাও লোকে দিত এবং বোধ হয় দিচ্ছেও।

শচীপতি বলিলেন—এ-ক্ষেত্রে পতনের কারণ কিছু দেখ্‌ছিনে—উন্নতির লক্ষণই ষোল আনা। দুই ভাই-ই বিশেষ শিক্ষিত, উপার্জ্জনে অক্ষম তারা কোনো দিনই হবে না। বাপের টাকা দু ভাগ হলেও ক্ষতি নেই—এক এক অংশে বিস্তর পাবে।...তার উপর ভেবে দেখ, ছেলের ধাপ্পাবাজ বাবা মেয়ের বাপ্‌কে ঠকিয়ে দাঁও মেরেছে, এ-দৃষ্টান্তও কম নয়—সম্পত্তি দেখায়, কিন্তু সে সম্পত্তি অন্যত্র আবদ্ধ; ছেলে চরিত্রহীন। এমনতরো ঘটে না কি?

—ঘটে। সবাই সমস্বরে স্বীকার করিলেন।

দীনবন্ধু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—লাখো লাখো।

শচীনাথ বলিলেন—তবে?

অর্থাৎ অভিজাত এবং ধন-সম্পন্ন আর নিষ্কলঙ্ক পরিবারে উভয় কন্যার বিবাহ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছ কেন?

মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী কালিদাসীর প্রাণে আনন্দ উত্তাল হইয়া কল্লোলিত হইতেছে...এই যোগাযোগ যে ঘটিতেছে তাহার কারণ মেয়েদের পয়, না পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য, না দেবতার আশীর্ব্বাদ, না কি এ? কালিদাসী চিন্তা করিয়া কূল পাইতেছেন না—

কিন্তু টাকা; এইখানটায় একটু নরম হইয়া কালিদাসী বলিলেন—কিন্তু টাকার বেলায় কিছু ছাড়্‌বে ব'লে মনে হয় না। ছেলের কি পাইকারী দর আছে?

মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—দাঁড় করাতে হবে। ছেলে দুটিই ভালো।

শুনিয়া কালিদাসীর নূতন করিয়া এত আনন্দ জন্মিল যে মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না—কথা এবং আনন্দ চোখের পথে উপচিয়া পড়িতে লাগিল....

মহেন্দ্র জানিতে চাহিলেন, এখানে ওরা চুলোচুলি করে না ত?

কালিদাসী বলিলেন—খেপেছ! গলায় গলায় ভাব।

শুনিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহা সত্যই যে, ছেলে দুটিই ভালো—

ইন্দ্রনাথের বড় ছেলে মনোরঞ্জন কৃতিত্বের সহিত এম্. এ. পাশ করিয়া বছরখানেক্ হইল সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার বেতন পঁচাত্তর টাকা—দ্রুত পদোন্নতি হইবে, মুরুব্বিগণ আশা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানরঞ্জন এম্. এ. পড়িতেছে—মেধাবী ছাত্র বলিয়া তার সুনাম আছে; তারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মুরুব্বিগণ তাহাকেও পদান্বিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন....

কালিদাসী এবং তাঁর সঙ্গিনীগণের বিশেষ আনন্দ এই যে, উল্টা কথা যে যতই বলুক, চাকরিতে দুধ-ভাতের বরাদ্দ অর্থাৎ যথার্থ শিক্ষার উপর লক্ষ্মীকান্ত ভগবানের সুদৃষ্টি এখনও আছে।

মনোরঞ্জন পিতামাতার প্রথম সন্তান। জীবজগতে স্ত্রীর চাইতে পুরুষের কলেবর বৃহৎ; শ্রী সম্বন্ধেও পুরুষই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুমিত! পিতা-মাতার প্রথম সন্তান আকারে অবয়বে সামর্থ্যে মহত্তর হইলে তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের সিদ্ধি বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে; কারণ যৌবনের সহজ এবং আদিতম উল্লাস আর তেজ পূর্ণতম প্রভাব লইয়া দেখা দেয় প্রথম সন্তানের দেহেই। এই নিয়মের বশেই হউক, কিংবা দৈবাৎই হউক মনোরঞ্জন জ্ঞানরঞ্জনের চাইতে উৎকৃষ্টতর—

কিন্তু এদিকে দেখিতে ভালো উষা—মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা—দ্বিতীয়া কন্যা তাঁর তৃতীয় সন্তান। বড় মেয়ে সতীর বর্ণও খুবই উজ্জ্বল, সে-ও গৌরাঙ্গিনী; তবু একটুখানি ছায়া-ম্লানিমা যেন তার রঙের উপর আছে—তা লক্ষ্য করিবার মত নয়, কিন্তু আছে বলিলে তা অস্বীকার করা চলে না। উষার রং আরও সুশ্রী—মুখখানা আরও ভালো—ছাঁদে খুঁত নাই; কিন্তু সতীর মুখখানা একটু ভাঙা-ভাঙা-মত—চুপসে যাওয়ার আভাসটি হঠাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু মন দিয়া দেখিলে তা ধরা যায়। সতীর দৃষ্টি যেন ভাববঞ্চিত বহির্মুখ; উষার চক্ষু চমৎকার ভাবময়—নিবিড়-পক্ষ্মের ছায়ার অভ্যন্তরে তার চক্ষু দুটি যেন মুকুলিত হইয়া আছে; তার নিবিড়তর চক্ষু দুটির দৃষ্টি তীরের মত ছুটিতে জানে না—মনে হয়, সে দেখিতেছে ভাসা-ভাসা ভাবে, যাহাকে দেখিতেছে তাহাকে প্রীতি-সিঞ্চিত করিয়া। কেহ কথা বলিলে সেই কথা শুনিবার অপরূপ একটি ভঙ্গিমা তার আছে—চোখের এবং গ্রীবার; তার ঐ ভঙ্গিমাকে বাহন পাইয়া বক্তার বচন যেন সহজেই মনোরম হইয়া ওঠে। কিন্তু কণ্ঠস্বর সতীরই মধুরতর—আলাপের বেলায় তার ভীরু স্বর-কূজনের আবেশটুকু যেমন নিরীহ তেম্‌নি কোমল লাগে, আর তা প্রাণের অনুকম্পন দিয়া গ্রহণ করার মত।....সতীর চুল লম্বা বেশি, উষার চুল গাঢ় বেশি; কিন্তু সকলের চাইতে লক্ষ্য করিবার মত উষার পদপৃষ্ঠ—পদপৃষ্ঠ ঠিক্ ততটা মাংসল যতটায় শিরাজাল কেবল আবৃত হইয়া থাকে; ঐ সুন্দর পদপৃষ্ঠের ক্রমা-বনতির শেষ হইয়াছে সুসজ্জ নখমালার প্রান্তে; একটি ক্ষীণ-কোমল রক্তাভা তার নখমালার শুভ্রতাকে ভারি সরস স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; অঙ্গুলিগুলি এমনি সুকুমার যে মনে হয়, দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করিলে দেখিতে দেখিতে লজ্জাবতী লতার পল্লবের মত বুঝি তারা অনিচ্ছা আর অসুখের বেদনা-ভরে তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে; তার পায়ের গঠনলালিত্যের দরুণ,

মনে হয়, পৃথিবীর বুকে সে পা পাতিয়া দাঁড়ায় আপনার লোককে অশেষ প্রীতিভরে স্পর্শ দিবার মত করিয়া ; সতী দাঁড়ায় আল্গা হইয়া ; তার পা অত সুন্দর নয়—আঙ্গুলগুলি লম্বাটে। সতীর ওষ্ঠাধর বিশেষত্বহীন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা গ্লানিজনক কিছু নাই ; কিন্তু উষার তা নয়—তার ওষ্ঠাধরে তার মনের বিলাসী স্তিমিত রূপটি ফুলের গায়ে আভার মত যেন প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ওষ্ঠের মধ্যস্থলটি একটু বেশি বিস্তৃত, ওষ্ঠপ্রান্তবাহী বন্ধনীর মত সেই রেখাটি একটু বেশি স্পষ্ট, আর অধর একটু চাপা বলিয়াই বোধ হয় অমন মনে হয়।

অমনি ওদের রূপ—

এবং রূপের বিচার দুই ভগিনী মনে মনে করে বই কি ! উষা নিশ্চয়ই জানে, দিদির চাইতে সে সুন্দরী····

প্রতিবেশিনীরা চোখে ঝাপ্সা দেখে না, আর তাদের রসনা অলস নহে—পানের ডাবর-বাটার সাম্নে বসিয়া মেয়েদের রূপের তুলনামূলক সমালোচনা তারা করিত····

"তোমার উষাই, বোন্, দেখ্তে আরও ভাল।"

"সতীই বা মন্দ কি !" বলিয়া সতী এবং উষার মা কালিদাসী কন্যার রূপের গরবিনী হইয়া হাসিতেন ; আর, একসঙ্গে চম্কিয়া উঠিতেন নয়নতারা, সুখময়ী, গুরুদাসী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণ···

অসহিষ্ণুভাবে পানের বাটায় একটা ঠেলা দিয়া অগ্রণী নয়নতারা বলিতেন, "মন্দ ! মন্দ বল্বে কোন্ চোখখাগী ! দেশ খুঁজে অমন আর-একটি কেউ আসুক দেখি !"—বলিয়া নয়নতারা পানের বাটা পুনরায় কোলের দিকে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ধম্কাইতে থাকিতেন তাদের

—যারা সতীর সম্বন্ধে ঐরূপ বিদ্রোহী মত্ প্রমাণাভাবসত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হয়।

রূপের দিক্ দিয়া সে-ই বড় এমন ব্যাখ্যামূলক উক্তি ঐ রকমে উষা অনেক শুনিয়াছে—বুঝিবার মত বয়স যখন হইয়াছে তখন হইতেই সে শুনিয়া আসিতেছে....কিন্তু সে নির্ব্বোধ নয়, অহংকার তার নাই—

সে বলে—দিদি, তোমার চাইতে আমি নাকি সুন্দর!—বলিয়া হাসিতে থাকে...যারা কাজের অভাবে ঐ অদরকারী বিচারের কাজে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া যায় তাদের মতের অকিঞ্চিৎ-করত্বের উদ্দেশে সে হাসে।

সতী বলে: তা সত্যিই ত। তোর বিয়েও হবে তেম্‌নি খুব বড় ঘরে।

—তোমার বুঝি গরীবের ঘরে হবে?

গরীবের ঘর কল্পনাতেও আতঙ্কজনক বই কি!

সতী বলে: আচ্ছা ভাই, যদি দাঁত-পড়া বুড়ো হয়?

—তবে তোমার আগে আমি দেব গলায় দড়ি।

আমার আগে মানে? আমি কি করব তা কি ক'রে জান্‌লি?

—কাঁদবে মা?

হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সতী বলে: দূর! বলিয়া সে হাসে, উষাও হাসে।

কিন্তু বুড়ো বা গরীবের হাতে ওরা কেউই পড়িল না—একই ধনী ঘরের দুই ভাই মনোরঞ্জন এবং জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে যথাক্রমে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল—কিঞ্চিদধিক দেড়ামাশুলেই ইন্দ্রনাথ ওদের 'পার' করিয়া লইয়া গেলেন।

মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বৈবাহিক প্রভৃতিকে প্রকৃত সন্তোষ দান করিলেন....প্রাণভরা যুগপৎ দু'টি জামাই পাইয়া তিনি নিজেও সন্তুষ্ট হইলেন যথেষ্ট; আর মেয়েরা দুই বাসরঘরে ছুটাছুটি করিয়া ছুটাছুটির আনন্দে অস্থির হইয়া গেল এবং উঠানের এত মাটি ঘরে তুলিল যে তার ইয়ত্তা নাই।

দুটি বধূরই রূপলাবণ্য মনোমুগ্ধকর—ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী এত তৃপ্ত হইলেন যে, মনে হইতে পারে ঐ সূত্রেই তাঁদের পরমানন্দের সঙ্গে পরমার্থও লাভ হইয়াছে—তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। লোকের মুখে প্রশংসা ধরিল না....মেয়েরা যেন জয়োৎসব সুরু করিয়া দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল...

অর্থাৎ বধূদ্বয় আদৃত হইল যৎপরোনাস্তি—

এবং দেখা গেল গার্হস্থ্য কাজে উভয়েই সমান পটু, আদেশ পালনে সমান তৎপর, মুখের কথা আর আহ্বান সমান মিষ্ট; ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রীর আরও মনে হয়, বেশ হইয়াছে, বেশ সাজিয়াছে, যাবজ্জীবনের জন্য লাভবান হইয়াছি—আর, এত ভালবাসিতে ইচ্ছা করে যে তা বলিবার নয়—

অষ্টপ্রহরই ওঁরা গদগদ হইয়া থাকেন...

কিন্তু বউয়েরা চা খায় না; বলে, অভ্যাস নাই। শুনিয়া ইন্দ্রনাথ দুঃখিত হইলেন—প্রিয়জন অকারণে আনন্দে বঞ্চিত হইলে যে দুঃখ জন্মে ইন্দ্রনাথের এই দুঃখ সেই দুঃখ।

বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনাথের পরিবার খানিক্ অগ্রগত পরিবার; তা-ই বলিয়া অসংযম কিছু নাই; কিন্তু ঘোম্‌টা দিয়া পরিবারেরই

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে অন্তরালের সৃষ্টি করা অযৌক্তিক এবং তাহার মূলে যে গুরু-লঘু-জ্ঞান থাকে তাহা অকারণ বলিয়াই তাঁর মনে হয়....এমন কি, কৌতুক জাগিয়া তাঁর একটু হাসিই পায় যখন তিনি ঘোম্‌টার কথা ভাবেন—আর মেয়েমানুষকে ভারি অপদার্থ ভীরু আর অস্বাভাবিক ক্রূর মনে হয়....ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া যাহাকে দূরে রাখা হয় সে হয়তো তাহার দরুণ একটা নিঃসঙ্গতার বেদনাই অনুভব করে....

এ-সব কথা তিনি প্রকাশ্যেই বলেন—

কিন্তু যা বলেন না তাহা এই যে, মনে হয়, ঘোম্‌টা দেওয়া নারী যেন মনে মনে অবিরাম কলহে উদ্যত হইয়া থাকে; আর ঘোমটার ইঙ্গিতে ইহাই সে ঘোষণা, এমন কি, স্বীকার করিতে চায় যে পুরুষের সঙ্গে প্রণয়িনী সম্পর্ক ছাড়া আর-কোন সম্পর্ক তার ঘটিতে পারে না; আর, পুরুষমাত্রেই নির্লজ্জ ত বটেই, দুর্বৃত্তও। পুরুষ সম্বন্ধে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া অধুনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে এবং বিবর্জ্জিত হইতেছে....

ইন্দ্রনাথ আরও বলেন যে পারিবারিক মিলনের কেন্দ্রে থাকে চা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের নিজের কাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যায় পর এবং ঘূর্ণন সুরু হইবার পূর্ব্বে প্রাতঃকালে চা-পান উপলক্ষে সকলের সমবেত হওয়ায় যে-আনন্দ আছে অন্য উপায়ে সে আনন্দ পাওয়া যায় না—

বলেন: অভ্যাস নেই, এই আপত্তি ছাড়া তোমাদের অপর কোনও আপত্তি নেই ত বৌমা?

—না। সতী ও উষা জানায়।

—তবে খেতে সুরু কর।

এম্‌নি করিয়া পুনঃ পুনঃ আহূত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া সতী ও উষা চা খাইতে স্বীকৃত হইল ; কিন্তু পুরুষবর্গের সম্মুখে যে ভারি লজ্জা করে !

কিন্তু সে-লজ্জাও তাদের ত্যাগ করিতে হইল—ইন্দ্রনাথ ডাকিয়া লইয়া আসরে বসাইয়া তাদের সে-লজ্জা ত্যাগ করাইলেন....

সতী ও উষা দেখিল ব্যাপারটা ভালই। প্রত্যেকেরই মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া তাদের কৌতুকে আনন্দে রহস্যে উজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণ করা আর আনন্দের অংশ গ্রহণ করা নিজেরই আনন্দবর্দ্ধনের একটা উপযুক্ত উপায়—মন তাহাতে চমৎকার সরস হয়—আবহাওয়াটা ভারি উপভোগ্য....

কিন্তু তাঁদের চায়ের মজলিস টেবিলে বসে না—রান্নাঘরের পাশে যে খাবার-ঘর আছে সেই ঘরে সবাই পিঁড়িতে বসিয়া খান্—গৃহিণী চা বিতরণ করেন....

ইন্দ্রনাথ ত রীতিমত আচমনই করেন—আর পরলোকগত পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে ভোজ্য ও পানীয়ের মধুময় সারাংশ উৎসর্গ করিয়া দেন।

চা খাইতে খাইতে মনোরঞ্জন একদিন বলিল, মা যদি কোন কারণে কোন দিন অনুপস্থিত থেকে চা না দেয়, তবে আমরা কি ক'রে চা খাব তা'-ই মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাবি।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল, বৌদি দেবে—মায়ের পরই বৌদি···

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর স্থান মায়ের অব্যবহিত নীচে ; কিন্তু মনোরঞ্জন আর কথা কহিল না—অনুমোদন করিয়া একটু হাসিলও না, যেন এই সেবাটুকু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নেই, অথবা সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে....

উষা ইহা লক্ষ্য করিল এবং পুলকিত না হইয়া পারিল না, কিন্তু পুলকের কারণটি এত অস্পষ্ট যে অলীক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে —অত্যন্ত আকস্মিক বলিয়াই বোধ হয় মনে মনে তাকে স্বীকার করিতেও বাধিল····

উষা তাকাইয়া দেখিল, সতী যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে।

তার পরদিনই ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ছোট বৌমার একটা মত নিই। বলিয়া উষার দিকে চাহিয়া রহিলেন····

উষা বলিল—ভালই হবে। বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারি কি-না দেখ্‌ব।

ইন্দনাথের মনে হইল, এই সপ্রতিভ উত্তরটি প্রখর বুদ্ধির লক্ষণ। বলিলেন,—বুদ্ধি তোমার চমৎকার, সে-পরিচয় আমরা পেয়েছি; কিন্তু এ-টা বুদ্ধি খাটাবার বিষয় নয়, সংসারে থাক্‌তে হ'লে অনুকম্পার বশে ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি-না, সেই সম্বন্ধে তোমাদের একটা মত চাই। বড় বৌমা, তোমারও মতটা দিও। আমার সঙ্গে তোমাদের মত মিল্‌লে বুঝব····বলিয়া ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন····ইন্দ্রনাথের ধরণই ঐ—কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করিয়া যান্‌।

—কি বুঝ্‌বেন, বাবা? উষা জানিতে চাহিল।

—হ্যাঁ; না, তা নয়; তবে বুঝব যে, বিজ্ঞ জুরীর বিচারে চক্ষুলজ্জাই বড়, কি স্বার্থই বড়। গরীব একটি ভাড়াটে আমার ছিল, পাঁচ মাসের বাড়ী ভাড়া না দিয়ে সে অন্য বাড়ীতে উঠে গেছে। নালিশ করেছিলাম —ডিক্রী হয়েছে। এখন বল, ডিক্রী জারি দিয়ে তার ঘটি বাটি ক্রোক করব, না ছেড়ে দেব?

উষা তৎক্ষণাৎ বলিল—ছেড়ে দিন্‌।

—বড় বৌমা কি বল?

সতী হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিল কে জানে; বলিল—উঁ হুঁ, টাকা আদায় ক'রে ফেরত দিন্।

ইন্দ্রনাথ জানিতে চাহিলেন, কেন?

—সে সত্যিই দিতে অক্ষম কি-না তা নিশ্চয় জানা নেই; তার কুমতলবও ত থাক্‌তে পারে। শিক্ষা হোক্।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় উষাকেই সালিশ মানিলেন—ছোট বৌমা, কি বল?

উষা বলিল—এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হলে যে লোকের অন্য কাজের আর অবসরই থাকে না। অন্যায় লোকে করছেই। অন্যায়ের দরুণ তাদের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হ'লে—

বাকিটা কল্পনা করিয়া লইয়া সবাই হাসিয়া উঠিল....

অন্যায়ের দরুণ অন্যায়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইলে কি রকম একটা বিপরীত গোঁয়ারতুমির কাণ্ড অবিরাম চালাইয়া যাইতে হয় তাহারই ছবি যেন সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া একটা পরিণত কৌতুকরসের সৃষ্টি করিল....

সতী দেখিল, সমস্যার মীমাংসা করা হইল না—পূর্ব্বাপরের সামঞ্জস্য রহিল না—তাঁহার সঙ্গে কাহার মতের মিল হইল তাহা ইন্দ্রনাথ বলিলেন না—বালসুলভ চপল একটা হাসির মধ্যে উষার জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করা হইল কেবল....

সতী অত্যন্ত আহত হইল।

বিবাহের পর মাস তিনেকের মধ্যেই দুই ভগিনীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল যে বাড়ীর সকলকার আগ্রহ উষার প্রতিই বেশি। তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়, কাজের ফরমাইসে, আহ্বানের বাহুল্যে, অর্থাৎ প্রয়োজনে

অপ্রয়োজনে বড়কে ডিঙাইয়া ছোটকে স্মরণ লওয়ায়, মনে হয়, নিতান্ত ভদ্রভাবেই ওঁদের সম্বিতে এবং উভয় বধূর মধ্যে যেন একটা মিষ্টতার তারতম্য লক্ষ্য এবং রক্ষা করা হইতেছে—খুব বেশি ভাল লাগা—আর তার চাইতে একটু কম ভাল লাগার অতি সূক্ষ্ম একটি ছেদ-রেখা উভয় বধূর মাঝখানে বসানো হইয়াছে। ইহা লইয়া ঘোরতর গর্ব্ব কি কলহ করা কি ইঙ্গিতেও অভিযুক্ত করা কিছুমাত্র চলে না; কিন্তু মনটাকে খুশী কি খারাপ করিয়া রাখা চলে যথেষ্ট....

বাড়ীর লোকের বিশেষ অপরাধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না—ভাল লাগার ব্যাপারে মানুষের মন খেয়ালী না হোক—অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত অবাধ, সেখানে তার অনিবার্য্য বিলাস; মনকে ধম্‌কাইয়া নিবৃত্ত করা যায় না—কর্ত্তব্য বুদ্ধির চাপ দিয়া দমন করা যায় না—ভাল লাগার আনন্দটুকু মানুষ কেবল অপরের মতামতের মুখ চাহিয়া নষ্ট করিতে চায় না। আবার এরূপ ক্ষেত্রে ইহাও সত্য যে, দৃষ্টির এই তারতম্য স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ হইয়া ধরা পড়ুক এ ইচ্ছাও কেহ করে না—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে হয়তো লজ্জিতই হইবে....

কিন্তু সতী কাহাকেও লজ্জা দিল না—

ঊষাকে একদিন বলিল—ঊষা, তোরই এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া উচিত ছিল, আর আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল অন্য কোথাও।

ঊষা যেন হঠাৎ বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কেন, দিদি? দাদা কিছু বলেছেন?

ভাসুরকে ঊষা দাদা বলে।

ঊষার প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে সতীর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল—

এ কি অন্যায় প্রশ্ন উষার? বলিল—তিনি কি বল্‌বেন? তোর কথার মানে আমি বুঝলাম না, উষা।

কিন্তু উষা ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের অপরাধ উপলব্ধি করিয়াছে; তার এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া সম্বন্ধে বাড়ীর বড়ছেলে কি বলিতে পারে! যদি বলে তবে সে-বলা যে কত দোষের তার কি ইয়ত্তা আছে, না তা ক্ষমা করা যায়!···ভারি অপ্রস্তুত, ভারি কুণ্ঠিত আর ভারি বিষণ্ণ হইয়া সে বলিল—তুমি আমার ওপর রেগেছ দিদি; কিন্তু আমি ত কোন অপরাধ করিনি! আমি তোমার ছোট বোন্, এখানেও সেখানেও। তুমি ত জানই আমি বড় একটু উপর-পড়া ছট্‌ফটে মানুষ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

আর কথা হইল না—

কিন্তু সতীর মনে হইল, একই বাড়ীতে দুই ভগিনীর বিবাহ একই দিনে না হইলে ভাল হইত। দুজনেই একসঙ্গে আসিয়া আসন লইয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তিনীর সম্মান আর প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ আসে নাই; জ্যেষ্ঠের গুরুত্ব আর তার দখল পাওয়ার অগ্রিম দাবি এখানে লক্ষিতই হয় নাই—একই পরিবার হইতে দুই সহোদরাকে বধূ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তুলনাগত একটা স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত দ্রুত আর স্বতই আসিয়া পড়া অসম্ভব হয় নাই—আপন বোন্ বলিয়াই বেপরোয়া হইয়া কর্ত্তৃত্ব খাটানো যাইতেছে না—মাত্র দু বৎসরের ছোট বোনের নিকট হইতে বড় বোনের মর্য্যাদা আদায়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়াও যেন কঠিনই—আজন্মের পরিচয়ও কেমন্ একটা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে যেন····বাপের বাড়ীতে গুরুত্বে তারা ছিল প্রায় সমান সমান। অন্য ঘরের মেয়ে হইলে চক্ষু-

লজ্জার ব্যাপারেও যে-জোর খাটিত, হঠাৎ বড়-জা হইয়া ছোট বোনের প্রতি সে-জোর খাটে না এমন নয়, কিন্তু একত্র লালিত ছোট বোনের কাছে তা কৌতুকপ্রদ, অবস্থাবিপাক-হিসাবে হাস্য-কর হইয়া ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—উষা হয়তো মনে মনে হাসেই—উষাই বড় হইয়া আছে, আর কোন কারণে নয়, উষার রূপ একটু বেশি, আর মুখ খানিক ধারালো বলিয়া।

সতী বড় ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু মনের কথা কাহাকেও জানিতে দেয় না—জ্যেষ্ঠত্ব স্থাপিত করার সুযোগ খুঁজিবার মত অধীরতা তার নাই।

এই প্রথম ওঁদের আলোকময় সরল স্বচ্ছ চলার পথে গাঢ় একটা ছায়া পড়িল, যাহার শোচনীয়তা এমনি যে, একটি সমগ্র দিন কাহার মুখে উচ্চ হাসি রহিল না। এই ঘটনার গুরুত্ব যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ওঁরা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন জ্ঞানরঞ্জনের কাতরতা দেখিয়া....

জ্ঞানরঞ্জন এম্‌-এ পরীক্ষায় বসিয়াছিল—

সংবাদ আসিয়াছে, সে ফেল্‌ করিয়াছে।

দুর্দ্দৈব সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি একবার পড়িতেছে অদৃষ্টের এ-পিঠে, পরক্ষণেই পড়িতেছে অদৃষ্টের ও-পিঠে—তাঁর এই দৃষ্টি কখনও বিরূপ, কখনও প্রসন্ন। তাঁরই কৃপায় এবং অত্যন্ত নিগূঢ় আর শুভ একটা যোগাযোগের ফলে মনোরঞ্জনের পদ-মর্য্যাদার সঙ্গে বেতন বাড়িয়া হইয়াছে একশো কুড়ি, অর্থাৎ প্রায় ডবল, এ-সংবাদও আসিল ঐ সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—এবং দেখিতে দেখিতে উৎসাহের আর অন্ত রহিল না—

জ্ঞানরঞ্জন নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জ্ঞানরঞ্জন ফেল্ করায় মনে অকস্মাৎ একটা ক্ষতিবোধ জাগিয়াছিল; মনোরঞ্জনের বেতনবৃদ্ধিতে সে ক্ষতিবোধ বিলুপ্ত হইয়া পুলক অন্তর আর দৃষ্টি ছাপাইয়া উৎসারিত হইতে লাগিল····

ছেলেদের বাপ-মায়ের কথা আলাদা—তাঁদের সুখ দুঃখ আর অনুকম্পা যথার্থ আন্তরিক—ছেলের অকৃতকার্য্যতায় তাঁরা ছেলেকেই সান্ত্বনা দিবেন এবং ছেলের পদোন্নতিতে তাঁরা ছেলেকে অভিনন্দিত করিবেনই····

কিন্তু বউয়েরা গেল অন্য দিক দিয়া—

পিতামাতা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করিলেন অদৃষ্টকে এবং কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিলেন ভগবানের প্রসন্নতাকে ; সতী এবং ঊষা স্বীকার করিল উহাদের কৃতিত্বকে এবং তার অভাবকে ; প্রশংসা অপ্রশংসাকে। একজনকে কাজের লোক এবং আর একজনকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তারা ছোট-বড়র ভেদ-দৃষ্টি লইয়া বক্র পথ ধরিল····

সতী তাহার জ্যেষ্ঠত্ব একটু জাহির না করিয়া পারিল না ; বলিল—ঠাকুরপো ফেল্ করলেন কেন! করতেন কি। তোর দোষ না পড়ে, ঊষা!

ঊষা বলিল, করতেন কি তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আর, দাদার মাইনে বাড়ায় যেমন তোমার হাত নেই, ওঁর ফেল্ করায় তেম্নি আমার পরামর্শ নেই, প্রশ্রয়ও নেই,।

সতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তা জানি। তবু····

—আমায় নিয়ে ব্যস্ত থাক্তেন, আর আমি তাঁকে ছেড়ে দিতে না চেয়ে তাঁর ক্ষতি করেছি, এই ত তুমি বলছ? কি করে তা জানলে তুমি? আর আমাকে তোমার ধম্‌কাবার কারণটা কি?

সতী তেমনি অনুত্তেজিতভাবেই বলিল—সে যা-ই হোক, তবু ফেল্ করার একটা অসম্মান ত আছেই। তোর উচিত ছিল ঠাকুরপোকে দূরে দূরে রাখা !....যাই। বলিয়া সতী চলিয়া গেল।

অসম্মানের কথায় ঊষা ভারি মলিন হইয়া উঠিল। দিদির তুলনায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—এই সম্মান তার প্রাপ্য, রূপের দরুণ প্রাপ্য, গুণের দরুণ প্রাপ্য। তাহার সম্মান আর স্বামীর সম্মান একাকার করিয়া লইয়া সে পরম পুলকিত হইত ; কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপার ঠিক্ তা নয়। তার সম্মানের স্থান আর মূল আলাদা—তা কেবল ঘরে পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহিরের সম্মান আসে স্বামীর মারফৎ। এই সম্মান আদায় করিয়া লইয়া স্বামীর সহযোগে দিদি অভ্রান্তভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব আর জ্যেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়াছে এবং করাইয়াছে—তাহাই সে জানাইতে আসিয়াছিল ; আর তা এমন সত্য যে, অস্বাভাবিক উগ্রভাবে রীতিলঙ্ঘন না করিয়া তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তার প্রতিবাদ করা চলে না।

অন্য ঘরে বিবাহ হইলে এই যন্ত্রণাটা সে পাইত না, ভাবিয়া ঊষা পিতার দুর্ব্বুদ্ধিকে আর নিজের অদৃষ্টকে আরও ধিক্কার দিল।

রাত্রে ঊষা স্বামীর কাছে জানিতে চাহিল—তুমি ফেল্ কর্‌লে যে ?

জ্ঞানরঞ্জন যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা ঘৃণ্য অপরাধ করিয়াছে, ঊষার কথায় এম্‌নি একটা তীব্র ভর্ৎসনার সুর। কিন্তু জ্ঞানরঞ্জন তা ভ্রূক্ষেপ করিল না—সে জানে, স্বামীর লজ্জায় স্ত্রীরও লজ্জা এবং লজ্জা যে দেয় তার উপর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। লঘুকণ্ঠে বলিল—অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত আজ রাত্রেই করব।

—তার মানে ?

—ওদিকে মুখ ক'রে শুয়ে থাকব—তোমার উল্টো দিকে—প্রাণ ফাট্‌ফাট্‌ করবে, সারারাত ঘুম হবে না, তবু অম্‌নি ক'রেই প'ড়ে থাক্‌ব।

ঊষা বলিল—অকর্ম্মা লোকেই ফাজিল আর বেহায়া হয় বেশি....

কণ্ঠ অত্যন্ত কঠোর।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল—গা'ল দিচ্ছ! বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আর বিস্মিত হইয়া রহিল। পরীক্ষায় ফেল্ করা এমন কি গর্হিত অপরাধ, আর তাতে এমন কি দুর্গতি ঘটিয়াছে যে স্ত্রীর মুখ দিয়া এমন তীব্র সুরে অসন্তোষের ভাষা নির্গত হইবে! বাবা-মা-দাদা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন, "ঘাব্‌ড়াসনে, মন একটুও খারাপ করিস্‌নে।" তার অকৃতকার্য্যতার প্রসঙ্গে তাঁরা কেবল ঐ কথা বলিয়াছেন। "ভাল করিয়া পড়।" বলিয়া আদেশ পর্য্যন্ত দেন নাই—তাহার বেদনা তাঁহারা অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া স্বাভাবিক বিবেচনার আর অপার স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু ঊষার মনে এমন কি আঘাত বাজিল যে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—তার এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি যে এমন মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যাপারটাকে সে গ্রহণ করিয়াছে!

অতিশয় ভালমানুষ জ্ঞানরঞ্জন অতিশয় ম্লানচক্ষে আর অসহায়ের মত ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল....

কিন্তু তবু ঊষা তাকে আমল দিল না; বলিল—আমাকে রায়গঞ্জে যেতে দাও একবার।

রায়গঞ্জে ঊষার পিত্রালয়!

জ্ঞানরঞ্জন মুদ্রিত চক্ষু খুলিয়া একবার ঊষার দিকে তাকাইল; তারপর বলিল—মা আর বাবাকে বল। তাঁরা যেতে দেবেন হয়তো।

সকালবেলা যথারীতি চায়ের মজলিস বসিয়াছে—সকলেই উপস্থিত আছেন····ইন্দ্রনাথ আচমন করিয়াছেন—মনোরঞ্জন গল্প করিতেছে যে কোথাকার এক সাহেব বিষাক্ত সর্পের চাষ করিতে শুরু করিয়াছে—গরু ভেড়ার মত বাথান করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ সে পালন করে; উদ্দেশ্য বিষ বিক্রয় করিয়া টাকা পাইবে—কিন্তু পাইলে হয়! বিষ নিংড়াইতে গিয়া····

সর্পদংশনে প্রাণ হারাইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করার ইচ্ছাই বোধ হয় মনোরঞ্জনের ছিল—

কিন্তু উষা হঠাৎ মাঝখানে বলিয়া উঠিল—বাবা, আমি একবার রায়গঞ্জে যাব। পাঠিয়ে দিন্।

কণ্ঠস্বরে আর যা-ই থাক্, নববধূপযোগী নম্রতা নাই।

ইন্দ্রনাথ নড়িয়া উঠিলেন; বলিলেন—কেন বৌমা? হঠাৎ এ-ইচ্ছা হ'ল কেন?

এ-ইচ্ছার উদয়ের কারণ উষা কিছু দেখাইত কি-না কে জানে—কিন্তু সতী তাকে অবসর দিল না; বলিল—ঠাকুরপো ফেল করেছে বলে' উষা ভারি লজ্জা পেয়েছে।

—তা-ই নাকি? বলিয়া ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে সবাই হাসিতে লাগিলেন, এমনভাবে যেন এমনধারা ছেলেমানুষী তাঁরা ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই।

কিন্তু উষা ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিল: দিদি তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—সে নীরব থাকিলেই পারিত! দিদি প্রতিশোধ লইতেছে—তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে দিদির অমানুষিক নির্ম্মম আগ্রহ দেখা দিয়াছে····

তার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেই হাস্য সম্বরণ করিলেন; ইন্দ্রনাথ তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিলেন—তা যেও মা, তোমার যেদিন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে....

বলিতে বলিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন সতী অন্য দিকে চোখ্ ফিরাইয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতেছে, আর উষা তাহার দিকে তাকাইয়া আছে এম্‌নি করিয়া—যেন তুমুল কলহের পর সে এই মাত্র থামিয়াছে, কিন্তু ক্রোধ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই....

সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন খুব।

পুলকে উচ্ছল কণ্ঠে সতী বলিল—বাবা, মাইনে বেড়েছে—একদিন দশজনকে ডেকে' ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া হোক্।

—বেশ, হোক্।....এবং তারপর সতীকেই সর্ব্বময়ীত্বের দিকে আরও অনেকটা আগাইয়া দিয়া ইন্দ্রনাথ বলিলেন, ফর্দ্দ কর। একটা ছুটির দিনে—

বলিতে বলিতে ইন্দ্রনাথ দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন যে এই মনোরম উল্লসিত পারিবারিক পরিধির ভিতর হইতে তাঁর ছোট বৌমা উষা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে....